গল্পছুট

ভ্রমণের ডানা মেলে

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪২৪, এপ্রিল ২০১৭

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : হরিসাধন দে অধিকারী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সূচির পাতা

সম্পাদকীয় ১

ভ্রমণ কথা ২ বরুণ দত্ত

আমার ভারতদর্শন ৩ সৌম্যশান্ত শাসমল

বনপথে মনপথে ৫ ধ্রুব বাগচী

মনে পুরাণ দেহে অতীত ও ঐতিহ্য ৭
ভাস্কর চোংদার

এই বাংলায় ১১ পত্রাঙ্গ বসু

বৃক্ষনাথের কোলে ১৪ চন্দন চক্রবর্তী

গড়পাহাড় জলনূপুর আর আমি ১৮
ঋত্বিক ঠাকুর

পাহাড়ে প্রথম পা ২১ দিবাকর দাস

ইমলি-তুতানের ডাইরি ২৪ প্রবীর কুমার বিশ্বাস

সুঁড়িপথ ২৭ সায়ন্তন ঠাকুর

লালমাটির দেশে কিছুদিন ২৯ মানসী পুরকায়স্থ

সীমান্ত ২৯ নন্দিতা সিনহা

আমার মানস ভ্রমণ ৩০ অসিত সরকার

কেন যাব না? ৩৩ ছন্দা দত্ত

রূপময় হিমালয়ের টানে ৩৫
হরিসাধন দে অধিকারী

উপেক্ষিত ৩৮ স্বাতি নন্দী

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে ৪০ শর্মালী দাস

আবেগে স্মরণে একটি রাত ৪৩ প্রবীর বসু

মা ৪৫ কমল সেন

সোঁদরবনে নানুবাবু ৪৬ তন্ময় ভট্টাচার্য

ইয়ুমথাং, সিকিম

ছবি - হরিসাধন দে অধিকারী

গণ্ডীছুট

ভ্রমণের ডানা মেলে

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪২৪, এপ্রিল ২০১৭

সম্পাদনা ঃ হরিসাধন দে অধিকারী

সহযোগী ঃ ড. দিলীপ কুমার দত্ত, ড. প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, অরিন্দম দত্ত, সনৎ গুপ্ত, উৎপল দাস, পত্রাঙ্গ বসু, ডা. আশীষ রায়, অঞ্জনা দে অধিকারী, শর্মালী দাস, মেঘনা রায়।

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ ভাস্কর চোংদার
(প্রস্তর রথ, গোপুরম বিজয় বিথালা মন্দির, হাম্পি)

অলংকরণ ও অক্ষর বিন্যাস ঃ সুররঞ্জন নন্দী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ 'ভ্রমণ আড্ডা' ভদ্রেশ্বর, হুগলী

মুদ্রণ ঃ নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ বি-৬/৮৭, কল্যাণী, নদীয়া,
পিন - ৭৪১২৩৫
ই-মেল ঃ gandhichhut@gmail.com
harisadhan.deadhikari@gmail.com
ফোন ঃ ৯৪৩৩৯ ১৫০২৮, ৯০০৭৬১১৩৯

প্রকাশক ঃ Kalyani People's Awarness Centre (Regd. under WB Societies Act 1961) -এর পক্ষে Dr. P. C. Manna,

Project Office :
B-12/54, Kalyani, Nadia, Pin - 741235.
E-mail : kpac.in@gmail.com
Ph. : (033) 2580 8009
Mob. : 98365 48233

বিনিময় ঃ ২৫ টাকা

'গণ্ডীছুট'-এ প্রকাশিত কোনও লেখা বা ছবি সম্পূর্ণ অথবা সম্পাদনা করে অন্যত্র প্রকাশের আগে সম্পাদকের অনুমতি একান্ত প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

শুভ নববর্ষে একঝাঁক ভ্রমণকথার ঝুলিসহ 'গণ্ডীছুট' তার বর্ষপূর্তি সংখ্যা নিয়ে পাঠকের দরবারে। আমাদের প্রয়াস চেনা উঠোন ছাড়িয়ে ভ্রমণকারীর স্মৃতি-সুধা ফিকে হবার আগেই গণ্ডীছুটের ষাণ্মাসিক মলাটে পাঠকদের মানস-সঙ্গী করা। বিগত দিনে পত্রিকার পাঠকদের আগ্রহ আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকগুণ। ভ্রামণিক লেখক-লেখিকারা তাঁদের সুনিপুণ লেখনীর মুনশিয়ানায় পাঠকদের জীবনের একঘেয়েমি কর্মপ্রবাহ থেকে ছুটি দিয়েছেন, মুক্তি দিয়েছেন তাঁদের চেতনার জড়ত্বকে। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে।

পত্রিকার শুভার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একসাথে চলার অঙ্গীকার করি, ভ্রমণের ডানা মেলি গণ্ডীছুটকে সঙ্গে করে। জীবনে আনুক ছন্দোময় গতি। মনে মনে হয়ে উঠি ভুবনভ্রামণিক।

সম্পাদক

ভ্রমণ কথা

বরুণ দত্ত

মন চল যাই ভ্রমণে।

অন্তরের ডাক শুনে পথের টান অনুভব হয়। কিন্তু কোথায়, কোন্‌দিকে, কোন্ পথে? কতদূর? চিন্তা কী? ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া ...। সঙ্গী? নাই বা জুটল। পথে বেরোলেই বন্ধু মিলবে। পথই পথিকের বন্ধু। ভ্রমণই জীবন, চলমানতাই জীবনের প্রতীক।

দু'চোখ মেলে চাইলেই মনকে যা আনন্দ দেয়, উদ্দীপিত করে, কল্পনায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়, নির্মল আনন্দ দানে যা সক্ষম, প্রতিদানহীন এই যে প্রাপ্তি, তাই ভ্রমণ।

উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রমণ, প্রাক্-প্রস্তুতি নিয়ে ভ্রমণ, আধুনিক কালের এক অন্যরকম প্রাপ্তি।

কত মানুষ, কত জনপদ, কত মেলা — মানুষের মিলনক্ষেত্র। সেখানে কত আছে জীবনের কথা, ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা, আনন্দ-নিরানন্দ, লাভ-ক্ষতির হিসেব — যা শ্রবণে বা দৃষ্টিপথে এসে মনকে নাড়া দেয় — সেটিই প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তির জন্য দূরে যেতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই, দূরই কাছে এসে ধরা দেবে।

সকলের ভ্রমণ যেমন একরকম নয়, ভ্রমণ কথাও তেমনই নানা ধরনের। দেখার চোখ আর চলবার পথের ভিন্নতা ছাড়াও বলবার ভাষা আর বর্ণনার ভঙ্গিতেও ভ্রমণ-কথার এত রকম ভেদ। এর আরও কারণ আছে। পথের গন্তব্যগত পার্থক্যই নয়, প্রকৃতিগত পার্থক্যও বহু। কাউকে ডাকে দুর্গম গিরিপথ, কারও মন ধায় অরণ্যে, কারও আসক্তি ইতিহাসে, কাউকে টানে অচিন দেশের অজানা জনপদের হাতছানি। তাছাড়া পথে নেমে কার কিসের আকর্ষণ, পথিক মনের সেও এক অতল রহস্য। যেখানে সর্বত্র সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্য পদচিহ্নের মধ্য দিয়ে পৃথিবী নিত্য নবীনতায় জেগে ওঠে — সেই বোধ, সেই অনুভূতি যার মনের আয়নায় সজীব হয়ে ওঠে, সেই ভ্রামণিক — সার্থক তার ভ্রমণ। ভ্রমণ-আড্ডাও মনকে সঞ্জীবিত করে। ভাব বিনিময়ের প্রাপ্তিও কম নয়।

অতীতে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেবার পর গুরু তাঁর শিষ্যকে দিতেন প্রব্রজ্যার নির্দেশ। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান লাভ, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, অজানা অচেনা পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিপদ বাধাকে জয় করা সহজ, প্রকৃতি ও মানব চরিত্র দর্শন, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, অসহায়তার বৃত্ত পূর্ণ করে জয়ী হয়ে এসো — নিয়ে এসো সঞ্চয় সম্পদ। সেটি কী? না, জ্ঞান, সাহস, বিশ্বাস সহমর্মীতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা। ভ্রমণে-পরিব্রাজনে যা অর্জন করেছ, তাই গুরুদক্ষিণা দাও তোমার সঞ্চয়ের ঝুলি-ভিক্ষাপাত্র উজাড় করে।

সাহিত্যিক সুবোধ কুমার চক্রবর্তী তাঁর কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এক সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যাঁর মাথায় জটা নেই, গায়ে ভস্ম নেই, গলায় নেই রুদ্রাক্ষের মালা। ব্যাঘ্র চর্ম বা কমন্ডলুও ছিল না তার সঙ্গে। অবাক হয়ে লেখক তাই বলেছিলেন, 'এ কেমন সাধু! পরনে একখন্ড কাপড়, গলায় পৈতে মাত্র সম্বল!' লেখকের বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে স্মিত হেসেছিলেন সাধু। তা দেখে লেখক অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হাসলেন কেন?'

সাধু সহজ উত্তর দিলেন, 'আমি সাধু নই, ভন্ডও নই। সাধু সাজলে ভন্ডামী হত।'

—'তবে সাধুর মতো ঘুরে বেড়ান কেন?'

—'ভাল লাগে তাই!' অর্থাৎ ঘুরে বেড়ানোর সখে তিনি সাধু হয়েছেন।

সংসারে থেকে আমরাও পথের ডাক শুনি। সে ডাক সমুদ্রের গর্জনের মতো নয়, বাঁশির সুরের মতোও নয়। সে ডাক ফুলের, ফুলের সৌরভের মতো বাতাসে বয়ে আসে। যা নেশার মতো মনকে আচ্ছন্ন করে, ডাকে, 'আয় — আয় —'

ভ্রমণ শুরু শিশুর 'হাঁটি হাঁটি পা পা, খোকন হাঁটে দেখে যা ...' দিয়ে। খোকনের সেই যে হাসি মুখ, আনন্দ উচ্ছ্বাস, তা দিয়েই ভ্রমণের সূচনা।

এই সুচনাই প্রাপ্ত বয়স্ককে টেনে নিয়ে যায় তুষার মৌলী হিমালয়ে, নিয়ে যায় গঙ্গার উৎসে, মরু বিজয়ে, উত্তর মেরু থেকে ফুলের উপত্যকায়। আরও দেখতে চাই — আরও। এই আকাঙ্খাই মনকে উজ্জীবিত রাখে। চলার সূচনা ছিল, অন্তিম বা ছেদ কোথায়, জানা নেই।

তাই জীবনের কাছে প্রার্থনা, চিত্তের অশ্রান্ত গতি যেন রুদ্ধ না হয়, আশায় যেন ছেদ না পড়ে। যে গতি গঙ্গার, যে গতি সৃষ্টিলোকের — সেই গতিই জীবনের। অতএব চরৈবেতি।

আমার ভারতদর্শন

সৌম্যশান্ত শাসমল

এক চোখ হাত দিয়ে চেপে, অপর চোখের অপলক দৃষ্টিপথে চলমান ছবি। ছবি মানে আলোর সামনে রিলের ছবি, সঙ্গে গ্রামাফোনে সিনেমার জনপ্রিয় চটুল গান। একে একে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাজমহল, ঝর্ণা, হাতি, ফুল, হিন্দি সিনেমার তারকা, নাচের দৃশ্য, মারপিটের মুহূর্ত! উত্তেজনার পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। বুকের ধুকপুকুনি শব্দ দূষণের মাত্রা ছুঁলো বুঝি। নিজের এলোমেলো শ্বাসে কাঁচের গায়ে ছানি পড়ছে থেকে থেকে। এক টাকার বিনিময়ে কয়েক মিনিটে সবকিছু চোখের তারায় ঠেসে নেওয়া। হারিয়ে যাওয়া এই যন্ত্রটির নাম 'বায়োস্কোপ'। ছোটবেলায় ডুগডুগির আওয়াজ কানে আসলেই মন উচাটন হয়ে উঠত। ইতিহাসের পাতায় চলে যাওয়া এই অবাক যন্ত্রের মাধ্যমেই আমার প্রথম ভারতদর্শন।

বেড়াবার নেশাটা বরাবরই ছিল, হয়ত সবারই থাকে। তবে জল, হাওয়া, তাপমাত্রা না পেলে যেমন বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না এও অনেকটা সেই রকম। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বেড়াবার পায়েখড়ির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সাধ আর সাধ্যের ফারাকটা আরো প্রকট হয়। তখন কিছুতেই কিছু হয় না। আবার কারো জোর করে যদিও বা হয়, তবু তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জ্বালা অনেক। যাদের এই ব্যাপারটা অনায়াসেই হয়, তাদেরকে হিংসে না করে উপায় নেই। সেই সব বঙ্গ পুঙ্গবদের চরণে শতকোটি প্রণাম।

দূর ভ্রমণের ক্ষেত্রে রেলভ্রমণ, এক বিশেষ অধ্যায় স্বরূপ। এই কার্যকরী অধ্যায় জীবনের দর্পণ। বয়সের প্রেক্ষিতে দেখবার আঙ্গিক বদলে যেতে থাকে, বদলে যেতে থাকে জীবনের দর্শন। সদ্য জ্ঞান হওয়া শৈশবে রেলের জানালায় অতটা গুরুত্ব থাকে না। বাইরের নেশাটা তখনও পেয়ে বসে না। তখন শুধু খাই খাই ভাব আর খেলার নেশা। অন্যের খাওয়া অর্জুনের দৃষ্টিতে দেখা আর ট্রেনে ওঠা হকারদের কাছ থেকে কিছু কেনার জন্য বেয়াড়া বায়না। ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লে বিশ্ব জয়ের ঝিলিক আর তা না হলে বায়নার রেশ পরবর্তী হকার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া। এছাড়া বিশেষ করণীয় কিছু নেই। সমবয়সী সহযাত্রী পেলে খেলার ছলে কাল-যাপন। তবে হারলে চলবে না।

বাল্যতেই প্রথম নেশাটা চাগাড় দিয়ে ওঠে। জানান দেয় সে আছে। বাইরের আলোর উৎসটা হাতছানি দিয়ে ডাকে। রেলপথের দুপাশটুকুতে ফুটে ওঠে গাছ, বাড়ি, খাল, বিল, মানুষ। একে একে। সুযোগ পেলে জানলার পাশে শান্ত হয়ে বসে তা নিরীক্ষণ করে। অংশ নেয় প্রকৃতি পাঠে। নতুন জিজ্ঞাসা, কিছু প্রশ্ন মনের কোণায় জমা হয়। নজরে আসে সাধারণ কিছু ঘটনা নতুন ভাবে। চলমান ট্রেনের জানলা দিয়ে প্রথম দেখা রেল লাইনের কাটাকুটি। গাড়ির সমান্তরালে চলতে চলতে হঠাৎ করে লাইনটা দুভাগ হয়ে যায়, আবার পরক্ষণেই অন্য একটা লাইন সাথে সাথে চলতে থাকে। সূর্যের আলো লাইনের ওপর পড়ে চিকচিক করে। লাইনের ধারের বৈদ্যুতিক তারগুলো নজররেখায় ওঠানামা করে। তারে বসা ফিঙে পাখি ধুত্তোর বলে উড়ে যায়। দূরে পাহাড়ের আবছা অবয়ব গাঢ় হয়।

আর কৈশোরে নেশা জমে ক্ষীর। একদম টং অবস্থা। আলেয়ার মত ডেকে রেলের জানলায় বেঁধে রাখে। তখন বাইরের জগৎটাকে জানলা দিয়ে দেখা ভ্রমণের এক নতুন সংযোজন। জানলা দিয়ে পিছনে সরে যাওয়া দৃশ্যপটে ভূগোলের পাঠ। ভূপ্রকৃতির সাথে বদলায় মানুষের বসতবাড়ি, সংস্কৃতি। বদলে যায় গ্রাম, শহরের রোজনামচা, নয়ানজুলির শালুক, সাথে সবুজে থৈ থৈ অন্তহীন চরাচর। ধানক্ষেতের মাঝে একাকী তালগাছ বা বনবাবলার ঝাড়। হঠাৎ করে যে রাস্তাটা ঢুকে গেছে রেললাইনের পেটে, লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে ওটা ওপারে কেমন বেরিয়েছে? মাঝে মাঝে নিমেষে পেরিয়ে যায় অনামা হাটুরে স্টেশন। আসলে স্টেশন বলে কিছু নেই, খানিক মোরাম বিছানো সমতল জায়গার পাশে, হেলে পড়া নামটাই তার বংশ পরিচয়ের একমাত্র সাক্ষ্য বহন করছে।

শুধু যে মনের শান্তি, তা কিন্তু নয়। রেলের জানলা চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়েছে অনেক কিছু। টুকরো স্মৃতি মনের কোণে সদা জাগরুক। মনে আছে কিরণডুল প্যাসেঞ্জার অলসভাবে এসে দাঁড়ালো সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে। কেমন যেন বেখাপ্পা স্টেশন। তবে স্টেশনের নামে চোখ যেতেই মনটা নেচে উঠল। সমুদ্রতল থেকে ৯৯৬ মিটার উঁচু ভারতের উচ্চতম ব্রডগেজ রেল স্টেশন — শিমিলিগুড়া। তবে ২০০৪ সালের পর সেই রেকর্ড ভেঙে নির্মিত হয় ১১৯ কিমি. লম্বা অনন্তনাগ — কাজিগুন্ড শাখার ব্রডগেজ রেলপথ। পুরো পথটাই সমুদ্রতল থেকে গড়ে দেড় হাজার মিটার উপরে নির্মিত। বর্তমানে ভারতের উচ্চতম ব্রডগেজ রেল স্টেশন কাজিগুন্ড, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৭৩০ মিটার উপরে। ভবিষ্যতে বিলাসপুর — মান্ডি — লে রেলপথ প্রস্তাবিত — যা আরো উচ্চতায় নির্মিত হবে। এই জানলা দিয়েই প্রথম দেখা

গোয়ার দুধসাগর জলপ্রপাত। ক'জন আর আলাদাভাবে এই জলপ্রপাত দেখতে আসেন। জানলা দিয়ে জরিপ করে জেনেছি রাজ্যের প্রধান ভাষাতেই স্টেশনের নাম বোর্ডে লেখা হয়। নীচে থাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি ও আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরাজীতে লেখা নাম। রাজ্য পাল্টে গেলে উপরে লেখা ভাষাটিও পাল্টে যায়। আরো জেনেছি গড় সমুদ্রতল (MSL) থেকে স্টেশনের উচ্চতাও বোর্ডের নীচের দিকে লেখা থাকে। কারণ উচ্চতার হেরফেরে গাড়ি চালনার দক্ষতার তারতম্য নির্ভর করে, এছাড়া বায়োমেট্রিক প্রেসার, ভার্টিক্যাল এক্সেল, অপটিক্যাল লেভেলসহ নানান বিজ্ঞানের কচকচি। এও জেনেছি নদীর ওপর সেতুর আগে-পরে ব্রীজের নাম, নদীর নাম, নম্বরসহ নানান সাঙ্কেতিক চিহ্ন দুদিকের প্রবেশ পথের দুপাশে কোণাকুনি অবস্থান করে।

বছরের বিভিন্ন সময়ে ঋতুচক্র বিজ্ঞাপন দেয় রেলের জানলার কিনারে। একই পথ নতুন রূপে ধরা দেয় ভিন্ন মরসুমে। কখনো প্রখর গরমে কাঁপা কাঁপা দৃশ্যপট, আবার বর্ষায় বনজ সবুজের আঘ্রাণ, শীতে পাতাঝরা শূন্য রিক্ততা, আর বসন্তে ফাগুন লাগা আগুন। একই চেনা পথ ডানা মেলে অচেনা রূপরেখায়। প্রতি যাত্রায় একাঙ্ক নাটক সম। একই দিনের ভিন্ন সময়ে পরিলক্ষিত হয় প্রকৃতির ভিন্নরূপ। আবছা ভোরে কুয়াশার চাদর ঢেকে রাখে শরীরী লজ্জা। রেলের জানলা দিয়ে ঠাওর হয় না কিছু। সময়ের সাথে সাথে একটা একটা করে গাছের আগা ফুটতে থাকে ঘোলাটে ক্যানভাসে। তারপর ধীরে বাড়ি, মানুষ, রাস্তাঘাট, জমির আল প্রকট হয়। গোলাপী সূর্যটা তারও পরে মাটি থেকে কয়েক হাত ওপরে টুকি দেয়। খটখটে দুপুরের উন্মুক্ত চরাচরে ঝরে পড়ে সোনা রোদের কুচি। গভীর জলে চিকচিক করে জোনাকির ঝাঁক। আর পড়ন্ত গোধূলির আলোতে বাজে দিনের বিদায়ী সুর। কনে দেখা আলোতে পাখিদের ঘরে ফেরা। আর রাত, সে তো আরো মায়াময়। দূরের এক ফোঁটা লণ্ঠনের আলো যেন আমার আরাধনার প্রদীপ। নিশুতি রাতে বাইরে তাকিয়ে দেখেছি, করাল আকাশে উজ্জ্বল তারাদের উপস্থিতি। ট্রেন চলে, ওরা স্থির থাকে। বাইরে কিছু না দেখা গেলে ক্ষতি নেই! চলন্ত ট্রেনে চোখ বুজে হাওয়া খাওয়ারও একটা মজা আছে। যেন মা পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে চোখে, মুখে।

এই বয়সে ট্রেনে করে ভারতের যে কোনো স্থান দর্শনে যাওয়া মানেই ঝক্কির একশেষ। পকেটের আয়তনে প্রথম শ্রেণী কুলোয় না। তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর শয়নকক্ষই ঠিক আছে। দিনের বেলায় সারা ভারত ঢুকে আসে ট্রেনের কামরায়। কাঁই-কিচির শেষ নেই। তবে আমায় টলানো মুশকিল। ঠিক সময় সুযোগ বুঝে জানলার গায়ে বুদবুদের মতো সেঁটে বসি। সবে বাইরেটা রোদে ভিজে কড়কড়ে হয়েছে এমন সময় হাততালি। হিজড়ে এসেছে টাকা চাইতে। খানিক পরে আমার গিন্নির কথা ভেসে আসে, হিজড়ের চুড়িদারের কালারটা দেখলে? আমি তো কবে থেকে ওই কালারের একটা জামদানী খুঁজছি। সামনের পুজোতেই আমার চাই। গিন্নির অভিযোগ, অনুযোগের পাহাড় বাইরের পাহাড়ের থেকে কম অনুচ্চ নয়। প্রতিক্ষণে উচ্চতা বাড়ছে। ফরমায়েসের ফিরিস্তির দফারফা। কর্ণকুহরে ট্রেনের আওয়াজকে অবলীলায় পিষে দু-চার কথা ঠিকরে বেরিয়ে আসে — অ্যাই আমার লিপস্টিকটা কোথায় গেল? চিরুনীটা একটু খুঁজে দাও না! আমার এক পাটি চটি! কি বাজে ট্রেন একটা ঝালমুড়িও ওঠে না। পাশের পাশের খোপে মাড়োয়ারী বৌটার চুড়ের ডিজাইনটা খুব সুন্দর। বিয়ের এত বছর পর বুঝে গিয়েছি বোবা-কালার শত্রু নেই। আমিও না শোনার ভান করি, হয়ত সত্যি সত্যি সব কথা শুনতে পাই না। কি সব সময় জানলার গরাদে মুখ ঝুলিয়ে বসে থাকো! এ অভিযোগও নতুন নয়। আমার স্ত্রীর ভারতদর্শন ট্রেনের কামরাতেই ঘুরপাক খায়। জানলা দিয়ে বাইরে বেরোবার অবকাশ নেই!

আর আমি? জানলায় মুখ লাগিয়ে চোখ দিয়ে শুষে নিচ্ছি সব কিছু। গিন্নির কথা আবহ সঙ্গীতের মতো কানে বাজছে। মনটা যেন আমাতে নেই। সত্যি সত্যি বেরিয়ে গেছে ভারত দর্শনে। নজরের সীমারেখা ছাড়িয়ে।

গুপ্তমুখ -এর আগামী সংখ্যা (শারদ) মহালয়া - ১৪২৪

বনপথে মনপথে

ধ্রুব বাগচী

মুখে এই কুলুপ আঁটলাম। সন্ধ্যাভাষা আর কইব না। সে বললে, 'সেটা আবার কেমনতর ভাষা'! কি ভাবে বোঝাই তারে ... আমার মনের মানুষটিরে ... এ ভাষা হল গিয়ে আধো অন্ধকার, আধো আলোর কথা। সন্ধে বেলার রূপ যেমনধারা হয়, না দিন না রাত্তির। যে ভাষায় চর্যাপদ কথা বলে, বাউল দেহতত্ত্ব গায়, এ হল সেই ভাষা। ধরি ধরি করছো কিন্তু অধরা। তোমার কথা মানুষে শুনছে একরকম অথচ তুমি বলছ ঠারেঠোরে। একমাত্র মহাজন যাঁরা, তাঁরা বলতে পারেন খোলসা করে। 'তা ওনারা কিভাবে বলবেন'? ওনারা বলবেন, 'দেখ বাছা, ইহার অর্থ প্রাঞ্জল করিয়া বলিতে পারা যায় না। বলিলে সুধীজনের নিকট অশ্লীল শুনাইবে।'

ডাক দিয়েছে সে অনেকদিন। সাড়া দেব কি দেব না করতে করতে হয়ে গেল দেরী। হে মহাজ্ঞানী পাঠকবর্গ, তোমরাই নিদান দাও, ফাঁকা রাস্তায় যুবতী নারীর ডাকে কত রকম অর্থ হয়। দাঁড়িয়ে যেতে বুকে বল লাগে। আবার সে ডাকে যদি মাদকতার মিশেল থাকে। আমি তো আর বৈরেগী বীবাগী না, যে পথের মাঝে বসে পড়ে তার ডাকে সাড়া দেব! তবে বাউলের একতারাটি সদাই বাজে মনের গহনে। সেই সঙ্গে কেউ হয়তো গায়, 'জগতের বাগানখানায় কৃষ্ণ থাকে ঘাপটি মেরে, ওরে রসিক মানুষ আছিস কে রে ...' গানটি শুনেছিলাম ডাউন শান্তিপুর লোকাল ট্রেনের এক বাউলের গলায়। উদাস হয়েছিলাম শুনে। এই হল সন্ধ্যাভাষায় ভাব চালাচালি। তা কেষ্ট থাকলে রাধা তো থাকবেই। উপরি যদি থাকে একতারার হাতছানি, তাহলে আমায় আটকানো বড় দায়। বেরিয়ে পড়েছিলাম রেলগাড়ি চেপে উত্তর পানে। এবার আমার বনের সাথে পিরীত।

(২)

একটা ফরিদপুরি গল্প দিয়ে আখ্যান শুরু করি। এক রিকশচালক চলেছে সুন্দরী সওয়ারি নিয়ে। চালাতে চালাতে বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে মহিলাকে। মানে না দেখে পারছে না। এতে বিরক্ত হয়ে একবার হাল্কা চালে বকুনি দিলেন চালককে। স্বভাবতই খারাপ লাগলো আর একটু রাগও হল তার। প্যাডেল করতে করতে বিড়বিড় করে বলল, 'হপনে আইবা না? তহন কি অইব? পরাণ ভৈরা দেখুম।' গল্পটি এক লেখক বন্ধুর থেকে ধার করা হলেও এতে এক দর্শন আছে। আগেই গেয়ে রেখেছি, নির্জন বনপথে কোন যুবতীর ডাক এড়ানো ভারি শক্ত। তা তেমনই কেউ আমাকে ডাক দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে আনে। এই যেমন আজ আমায় ডেকেছে। আমি তার ফেরে পড়েছি। বাস্তবে তার রূপবর্ণনা করতে পারি না। বলতে পারি না সে আদতে কেমন। কেবল ডাক শুনতে পাই তার। আর ঐ রিকশচালকের মত প্রাণ ভরে স্বপ্নে দেখি তাকে। আখতারী বাঈ-এর গজলে শুনেছি, 'যব মুঢ় কর মুস্কুরাও, উহ ফান্দা মেরি লিয়ে ... পদ্য করে বললে দাঁড়ায়, তার পিছন ফিরে হাসি, জানবে তোমার গলায় ফাঁসি ... এই ফাঁস আমরা অনেকেই পড়তে বাধ্য হই। কেউ পাহাড়ের টানে, কেউ সমুদ্রের হাতছানিতে গলা বাড়িয়ে দিয়ে আসি। এখন আমার ফাঁস এই বনভূমে আর মনভূমে।

ঘন অরণ্যের মাঝে পায়ে চলা পথ দিয়ে চলেছি, চোখে পড়ল মানুষের হত্যালীলা। বিশেষ করে গরান গাছগুলোর বেশির ভাগ কাটা হয়েছে গুঁড়ি থেকে। এখনো লেগে আছে তার রক্তের দাগ। থমকে গেলাম। লোভ আর লালসার পরিণতি। তার আগে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিশ্চিতভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে তাদের। ভাবলাম এ কোন পৃথিবীতে আমরা পরম সুখে বাস করছি। এই প্রসঙ্গে লিঙ্কনের একটা প্রবাদ প্রতিম কথা মনে পড়ে গেল, 'গিভ মি সিক্স আওয়ারস টু চপ ডাউন এ ট্রি, আই উইল স্পেন্ড দ্য ফার্স্ট ফোর শারপেনিং মাই এক্স।' আমাদের সেই ধৈর্যও নেই ভাববার, কি কাটছি আর কেন কাটছি। আর এ কথা কে না জানে, ক্রুয়েলটি টুয়ার্ডস আদারস, ইজ অলসো ক্রুয়েলটি টুয়ার্ডস আওয়ারসেলভস। তার পরিণতি বেশ কিছু বছর আগে থেকেই আমরা পেয়ে আসছি। যাক, নসীব তো আপনা আপনা...

(৩)

জায়গার নাম মাদারিহাটের সুপরিচিত জলদাপাড়া। অনেক আগে এ জায়গার নাম ছিল টোটোপাড়া। কাছেই তোর্সা নদী। যেখানে উঠলাম সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিস্ট লজ। কাঠের দোতলা বাড়ি। অনেকটা বৃটিশ আমলের কাছাড়ি বাড়ির মত। কাঠের বারান্দা লাগোয়া ওপর নিচে অনেকগুলো ঘর। মোটা কাঠের গুঁড়ির ওপর টানা বারান্দা। হাঁটলে এক ধরনের অভিজাত শব্দ হয়। সামনে ছড়ানো অনেকটা জমি। সেখানে রয়েছে সিমেন্ট বাঁধানো খাঁচা। তিনটে চিতা বাঘের বাচ্চা খেলে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ওরা সামনের চা বাগান থেকে ছিটকে চলে এসেছে। এই চিতারা ছোট ছোট দলে চা বাগানের চা গাছের মধ্যে সন্ধ্যের মুখে বেড়াতে আসে। দাঁড়িয়ে থাকলে

কিছুই বোঝা যায় না। আবার গুড়ি মেরে বসলে চা বাগানের সবটুকু দেখা যায়। কারণ চা গাছের গোড়া আর কান্ডটি পরিষ্কার। সেখানে কোন পাতা থাকে না। আর আমরা যে তিন সাড়ে তিনফুট সমান্তরাল চা গাছ দেখি, আসলে স্বাভাবিকভাবে একটা চা গাছের আট ন ফুট উচ্চতা হয়। চা পাতা তোলার সুবিধের জন্য এই উচ্চতাকে রাখা হয়। দুপুরের পর চা পাতা তোলা বন্ধ। দিনের আলোতেই চা পাতা তোলার নিয়ম। এবার লজটিকে ঘুরে ফিরে দেখতে বেরোলাম। ঘরে ঢুকেই দেখি পিছনে ঘন অরণ্য। একপাশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত চা-বাগান। ভালো করে দেখার জন্য ছাদে উঠলাম। চোখে পড়ল একদল হাতি চলেছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। ওদের যাওয়ার মধ্যে এক আভিজাত্য আছে। গজেন্দ্র গমন যাকে বলে। সামনে পথ দেখিয়ে চলেছে সর্দার হাতি। সেই আকারে সবচেয়ে বড়। আলো পড়ে তার দাঁত জোড়া ঝকঝক করছে। একটা বাচ্চা হাতি মায়ের পায়ে পায়ে চলেছে। তার পিছনে আরো সাত আটটা। অনেকটা সময় কেটে গেল ওদের দেখে। তারপর বিশাল ঘাসের আড়ালে। এই প্রজাতি ঘাসেদের নামও হাতির নামে। এলিফ্যান্ট গ্রাস। হাতির চেয়েও ঘাসের উচ্চতা বেশি, তারই আড়ালে এখন ওরা চলে গেল। আসতে আসতে শেষ বিকেল ফুরিয়ে যাওয়ার পথে। নামতে যাব, চোখ আটকে গেল শাল সেগুন বহেরার অরণ্যে। ওদের ডালপালার মধ্যে দিয়ে বিশাল এক ঘিয়ে রং-এর চাঁদ শান্ত হয়ে দেখছে আমাকে। এখন সে জোছনাহীনা। সে নিজে পোড়ে অপরকে পোড়ায়।

(৪)

আকাশের এই খেলা ভারি পছন্দের আমার। সন্ধে নেমেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার কনসার্ট ঠিক ঘন্টার মত বাজছে তাল মিলিয়ে এই অরণ্য মন্দিরে। স্থবির হয়ে শুনছি। ঘরে ঢুকে দেখি কয়েকটা জোনাকি কখন ঘরে ঢুকে ওড়াউড়ি করছে। নিজেদের মধ্যে খেলা আর কি। জোনাকির এই আলোর ইশারা লগ্ন হওয়ার জন্য। আহা প্রকৃতির প্রাণীকুলেরও কত ভালোবাসা! মানুষ যদি এইটুকু শিখতো, দুনিয়ার চেহারা পাল্টে যেত! এখানে কু পিতা সুযোগ পেলে নিজের সুকন্যাকেও ছাড়ে না! ওদের দেখতে দেখতে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। জানলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি অরণ্যের কালো অন্ধকার ছাড়িয়ে দূরে কয়েকটা আলোর বিন্দু। আকাশের রঙ লালচে। মেঘ ডেকে উঠলো। একটা কাছে কোথাও বাজ পড়লো। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম সামনের বারান্দায়। বৃষ্টি শুরু হল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ পান করতে লাগলাম সেই দৃশ্য। গাছেদের পাতায় তার ঝরে পড়ার শব্দ, আহঃ। পৃথিবীর কোন বাদ্যযন্ত্র এমন শব্দ সৃষ্টি করতে পারবে না কোনদিন। থামের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জামায় এসে পড়ছে সাদা সর্ষের মত বৃষ্টির ছাটের গুঁড়ো। কানটা কখন ঠেকে গেছে। এক অদ্ভুত সুরেলা শব্দ। যেন ক্ষিরোদ নট্টোর ঢোল বাজছে। ভেবেই পেলাম না শব্দের উৎস! শব্দ এত শৃঙ্খল হতে পারে! কিন্তু আসছে কোথা থেকে! অন্য পাশে তাকিয়ে দেখি, বড়ো বড়ো লাল পিঁপড়ে সার দিয়ে নিচে থেকে ওপরে উঠছে। বাসায় ফিরছে তাড়াতাড়ি। এই শব্দ ওদের চলার পায়ের আওয়াজ। এখানে টিভি বা মাইক বাজার শব্দ নেই। তাই এত স্পষ্ট। বাহ, এ দেখাও কপালে ছিল।

(৫)

যার বাঁধনে বাঁধা পড়েছি তার পদতলে আর শরীরে অর্থাৎ ঘাসে, গাছের গোড়ায়, তার নুয়ে পড়া পাতায় মাথা ঠেকাচ্ছি মনে মনে। সে আমায় ধারণ করছে তার প্রতি অঙ্গে। পাখিদের গলায় প্রকাশ করছে তার সাংকেতিক ভাষা। শুকনো মাটিতে যে ভাবে জল শিকড়ের গভীরে পৌঁছে যায় আমিও তেমনভাবে প্রবেশ করছি তার গভীরে। অরণ্যের ভাষার সাথে কিছুটা পরিচয় থাকলেও প্রকাশ করার শিক্ষা আমার নেই। বড়জোড় বলতে পারি, 'এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে...।' বুঝি, এ একধরনের সাধনা গভীরে প্রবেশ করতে হয়। তবে সাধকরা কেন বলেন, 'আপন সাধন কথা, না কহিবে যথা তথা।' এ ব্যাপারে আমি ভারি অবাধ্য মানুষ।

পরদিন বিকেলে জঙ্গলের পথ না ধরে বড়ো রাস্তায় এলাম। যে পথ ভুটানের দিকে গিয়েছে, আরো পূর্বে। আমিও সেই দিকে চলেছি। হাইওয়ে মনে হল, তবে গতরে কিছুটা খাটো। কানে এল মাইকে বাজছে গান। ঠাহর হল না গানের ভাষা। মহিলা কণ্ঠ, সুরজ্ঞান চলনসই। আমার কোন নির্দিষ্ট পথ নেই যে! তবে সন্ধের আগে ফিরতে হবে, আর ফেরাটাই মঙ্গল। গানের রেশ ধরে রাস্তা থেকে নেমে একটা মেঠো পথে পা বাড়ালাম। এবার কিছুটা স্পষ্ট হল গান, লোকগীতি। পায়ে পায়ে চলে এলাম সেখানে। একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে মাটির ওপর। ছেঁড়া সতরঞ্চি, মাথায় চট টাঙানো। ওটাই মঞ্চ। বাকিরা কেউ চাটাই বা সেরকম কিছুর ওপর সামনে বসে গান শোনায় মগ্ন। ব্যাটারি মাইকে একপাশে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম গান। সেই মহিলা তারসপ্তকে বাঁধা স্বরে গান শেষ করলেন। এরপর মঞ্চে এলো এক বালক। বেশ মিষ্টি গলা তো! বাঙাল ভাষায় গানের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এইটুকু বালক, নিজের পরিচয়ে বলল সে চা বাগানে কাজ করে তার বাবার সঙ্গে। কিন্তু গানের কথার আর্তি হয়তো ইহজীবনে ভুলতে পারব না। 'সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন সে বাড়ি ফেরে, তখন সে এতটাই ক্ষুধার্ত যে ইচ্ছে থাকলেও ঈশ্বরকে ডাকার আর শক্তি থাকে না। এজন্য ঈশ্বর তাকে যেন ক্ষমা করে দেন।' কী সাংঘাতিক আর চরম এক সত্যের মুখোমুখি হলাম। কারণ না অকারণ বলতে পারবো না, মনটা বেশ ভার হয়ে গেল। বাইরে কখন সন্ধে নেমেছে কে জানে।

মনে পুরাণ দেহে অতীত ও ঐতিহ্য

ভাস্কর চোংদার

মাতঙ্গ পাহাড় থেকে

ছবি - লেখক

বাদামি, আইহোল ও পাট্টাডাকাল ক্ষেত্র দেখার পর ঠিক ছিল ট্রেনে গডগ্ থেকে হস্পেট্ যাবো। একটা দোটানা চলছিল। ট্রেনে না গাড়ীতে? যে ড্রাইভার বন্ধু এলাকাটি যত্ন করে দেখালেন তাকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়! প্রস্তাবে রাজি হওয়ায় সংরক্ষিত টিকিটে হস্পেট্ যাওয়া বাতিল করা হলো।

বাদামি থেকে হাম্পি কমবেশী ১৪০ কিমির পথ। সময় লাগল ঘন্টা চারেক। মাঝে বিরতি ছিল আধ ঘন্টার। প্রথমটা কিছুটা একঘেয়েমিতে কাটলো। হাম্পির কাছাকাছি রাজপথের দুপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য গ্রানিটিক বোল্ডার। প্রকৃতির আপন হাতের ছোঁয়ায় সৃষ্টি। তাল ও নারকেলের সহাবস্থানে ল্যান্ডস্কেপ বেশ চার্মিং। বোল্ডারের ভারসাম্য অবস্থান একে কিছুটা 'ব্যালান্সড রক কান্ট্রী' বলে মনে করায়।

আমাদের গন্তব্য কমলাপুরম কে এস টি ডি সি গেষ্ট হাউস। কমলাপুরম হাম্পির দুটো প্রবেশ পথের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। একটি বড় এলাকার একদিকে একতলা গেষ্ট হাউস। ঘরের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে মি. দেশমুখ। দেশের বাড়ি বিজাপুর।

দূরভাষে আলাপ থাকলেও প্রথাগতভাবে দায়িত্ব পালন করে ও করিয়ে বুঝিয়ে দিলেন আমাদের দিন তিনেকের আশ্রয়স্থল। আর বললেন বসবেন আমাদের সঙ্গে, সামান্য বিশ্রামের পর। বিষয় থাকবে হাম্পি — তার পুরাণ, অতীত ও ঐতিহ্য।

মধ্যাহ্নকালীন দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তি থেকে মুক্তির জন্য বিশ্রামের বদলে ওনার সঙ্গে বসে পড়াটাই শ্রেয় বলে মনে হলো। তাই সে পথটাই বেছে নিলাম। প্রথমেই সামনে মেলে ধরলেন একটা বারো পাতার ক্যালেন্ডার। দেখলাম পাতায় পাতায় রয়েছে বিবর্তনের ইতিবৃত্ত। পুরোনো হাম্পির ভগ্নাবশেষ থেকে সংস্কারের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে হয়ে ওঠা আজকের বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল হাম্পি। প্রথমে এল পুরাণ, তারপর একে একে প্রকাশ পেল তার অতীত ও ঐতিহ্য। কিছুটা ধারণা থাকলেও হাম্পির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আকর্ষণ জন্ম নিলো তার হাত ধরে।

ছেলেবেলার ইতিহাস বই, একটু বড় হয়ে উঠে শরদিন্দুর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', এ এস আই-এর বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল গ্রন্থমালা, ইন্টারনেটে পাওয়া পিডিএফ অথবা বই-এর ঝাঁকুনিতে মস্তিষ্ক কিছুটা বেসামাল। নির্বাক বসন্তের ইঙ্গিত এল কিছুটা একাকিত্বের

পর। এবার শুরু হল একাকী পথ চলা, মনে মনে। অতীতের পম্পাক্ষেত্র, কিস্কিন্ধা ক্ষেত্র বা ভাস্করক্ষেত্র প্রাচীনকাল থেকে আজও বয়ে নিয়ে চলেছে ঐতিহ্যের নিদর্শন। হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র। তুঙ্গভদ্রার পুরোনো নাম ছিল পম্পা, যার দক্ষিণ দিকে ছিল হাম্পি। হয়ত কন্নড় ভাষায় পম্পাই হয়ে উঠেছিল হাম্পি! পৌরাণিক মতে, হাম্পির খুব কাছেই ছিল রামায়ণের কিস্কিন্ধা ক্ষেত্র। বানর রাজ বালি ও সুগ্রীবের রাজ্য পাঠ ছিল এই কিস্কিন্ধা। দুজনের মধ্যে ঝামেলায় উদ্বাস্তু হিসাবে সুগ্রীবকে আশ্রয় নিতে হয় মাতঙ্গ পর্বতে, সঙ্গী হিসেবে হনুমান। অপহৃত সীতাকে অনুসন্ধানের সময় রাম ও লক্ষণ এসে হাজির হন এখানে, সাক্ষাৎ হয় সুগ্রীব ও হনুমানের সঙ্গে। রামের হাতে মৃত্যু হয় বালির। পুরোনো রাজ্যপাট ফিরে পায় সুগ্রীব। রাম ও লক্ষ্মণকে অপেক্ষা করতে হয় কাছের মাল্যবন্ত পর্বতে, সীতাকে উদ্ধার করতে যাওয়া হনুমানের জন্য। কথিত যে হাম্পির অদূরবর্তী নিম্বাপুরমে সমাহিত করা হয় বালিকে। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ পাড়ে গুহার মধ্যে সীতার ফেলতে ফেলতে যাওয়া গহনা লুকিয়ে রাখে সুগ্রীব। অঞ্জনাগিরি, ঋষ্যমুখ পর্বত পম্পাসারের ছড়ানো ছেটানো জলাশয়গুলোও রামায়নের সাক্ষী দিতে আজও প্রস্তুত হয়ে আছে।

এবার আবার বসার পালা। কিভাবে দেখতে হবে হাম্পিকে তা বুঝে নেবারও পালা। সময় ঠিক হলো - আগামীকাল সকাল ৭টা। একটা অটোতে জনাকয়েকের দল রওনা হবে। ড্রাইভার হনুমানকে পুরো সার্কিটটা বুঝিয়ে দিলেন। ড্রাইভার চলে গেল।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে উত্তর কর্ণাটকের এই অঞ্চলের আবহাওয়া বেশ মেজাজী। ভোরে মৃদুমন্দ হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকালে আলোর উপস্থিতি সাজানো বাগানটাকে বেশ মায়াবী করে গড়ে তুলেছে। হনুমান ভাই-এর সাজানো সূচী অনুযায়ী হাম্পি পুনরাবিষ্কারের সূচনা হল। কমলাপুরমের উত্তর পশ্চিমে ও উত্তরের এলাকাটি হল প্রথম সার্কিট যার প্রথম দর্শনীয় মন্দিরটি হল বিরূপাক্ষ মন্দির। অন্য নাম পম্পাবতী মন্দির। বহু প্রাচীনকাল থেকেই হাম্পির পবিত্রতম এটি। তবে সর্বশেষ সংস্কার হয় ১৫১০ সালে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের হাতে। পায়ে পায়ে গোপুরম হতে মন্দিরের বিগ্রহের দিকে এগিয়ে চলি। বিরূপাক্ষ ছাড়াও চোখে পড়ে পম্পা, ভুবনেশ্বরী সহ আরো অনেককে। মন্দিরের সমগ্র অংশেই ভাস্কর্য চিত্রকলার নিদর্শন। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরশৈলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে মনে হয়। এগিয়ে চলি বিরূপাক্ষের ডান হাতি হেমকূট পাহাড় বরাবর। বিজয়নগর পূর্ব ও কালীন সময়ে তৈরী মন্দিরের সমাবেশ রয়েছে এখানে। প্রামাণ্য তথ্যের অপব্যাখ্যায় এই দৈব মন্দিরগুলি জৈনতীর্থ বলেও দাবি করা হয়। যাই হোক হেমকূট পাহাড়ের নিজস্বতা এমনই যে মাঝে মাঝে গ্রীসীয় স্থাপত্যের মৃদু প্রভাব আছে বলে মনে হয়। বিশেষতঃ সূর্যাস্তের সময় তার ভাস্কর্যের সিল্যুয়েট অন্য মাত্রা যোগ করে। এবার নেমে আসার পালা। ছবি আঁকিয়ে দু-চারজনের ল্যান্ডস্কেপ দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই, বিরূপাক্ষ তথা হাম্পি বাজারের মধ্যে। কথিত একসময় হাম্পির সর্বোৎকৃষ্ট বাজার ছিল এটি। ডমিঙ্গো পেস (Domingo Paes) - কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে ভ্রমণে এসে বলেন - "You have a broad and beautiful street, full of rows of fine houses and mantapas ... in this street live many merchants and there you will find all sorts of rubies and diamonds, and emeralds, and pearls and seed-pearls and clothes and every other sort of thing there is on earth and that you may wish to buy..."

সুদীর্ঘ, প্রশস্ত এই বাজার আজও যথেষ্ট জমজমাট লাগে। হাম্পি বাজারের বেশ কিছুটা পশ্চিমে পাই মূল ফেরীঘাট যেখানে দেশজ নৌকায় পারাপার করছেন দেশী ও বিদেশীরা। পাড় বরাবর গড়ে ওঠা স্থানীয় দোকানীদের কাছে চা ও কফির ব্যবস্থাসহ কিছুটা অবসর যাপন এগোবার ইচ্ছাকে আরো জাগিয়ে তোলে। বাজারের মধ্যে থেকে কিছুটা আঁকাবাঁকা পথে পশ্চিমে পাই হাম্পির পবিত্রতম চক্রতীর্থ ঘাট। করাক্কলকে সঙ্গে নিয়ে তুঙ্গভদ্রার উত্তর তীর ও দক্ষিণ তীর বরাবর একঝলক সঞ্চালন প্রকৃতি ও মানুষের ভাস্কর্যকে একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়। জলপ্রবাহের ফলে সৃষ্ট ভাস্কর্যের সঙ্গে মানুষের তৈরী বিগ্রহের মেলবন্ধন ঘটে এই ঘাটের দুপাশে। তীর্থযাত্রীদের অধিকাংশই পুণ্যস্নান সেরে পৌঁছচ্ছেন গন্তব্যস্থলে। আমরা ভ্রমণার্থী ফলে আমাদের আবার এগিয়ে চলা। হেমকূটের অন্যদিকে আগ্নেয় শিলাগঠিত দুই মনোলিথিক গণেশের ছোটোটি সসেভি কালু গণেশ ও বড়টি কাডালে কালু গণেশ। একে অপরের দ্বিগুণ উচ্চতাসম্পন্ন। বিদেশীদের স্পর্শ করে দেখার প্রবণতা দেখতে বেশ মজা পাওয়া গেল। দুই রাস্তার সংযোগস্থলে পেলাম বালকৃষ্ণ মন্দির - তৈরী করেছিলেন রাজা কৃষ্ণ দেবরায় ১৫১৩-তে - তাঁর ওড়িশা বিজয়ের সাক্ষ্যরূপে। মন্দিরটির মধ্যে বিজয়নগর রাজ্যের মন্দির শৈলীর বিশেষত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কৃষ্ণ মন্দিরের পাশেই ছিল কৃষ্ণ বাজার। কিছুটা দক্ষিণে এগোতেই বাদাভি লিঙ্গম, হাম্পির জলে নিমজ্জিত বৃহত্তম ও উচ্চতম শিবলিঙ্গ। পুজারির ফুল চাপানোর মুহূর্তটিতে বহু প্রচেষ্টা বেশ দেখার মতো। বাদাভি লিঙ্গম দেখে ফেরার পথে পড়ে লক্ষ্মী-নরসীমা বা উগ্রনরসীমা মূর্তি। সুউচ্চ এটিকে দেখে মনে ভীতির সঞ্চার হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নয়। বাদাভি লিঙ্গম ও উগ্রনরসীমা মূর্তি দুটি থেকে বিজয়নগরের ভাস্করদের দক্ষতা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। তুরুট্টু খাল পেরিয়ে পৌঁছানো যায় চন্ডীকেশ্বর মন্দিরে যা মূলত বৈষ্ণব ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত।

চন্ডীকেশ্বর মন্দির দেখে রাস্তার অপর পারের সরস্বতী মন্দির ও উদ্ধানা বীরভদ্র মন্দির দেখে শরীর বেশ ক্লান্ত বোধ হওয়ায় সামান্য জলপানের বিরতি ঘোষণা করা হল। সূর্যের অবস্থান বেশ কিছুটা ওপরে এসে পৌঁছেছে। সামান্য খাওয়া দাওয়ার পর পৌঁছোলাম দ্বিতীয় সার্কিটে — রয়্যাল সিটাডেল। ভৌম মন্দিরে পৌঁছোনোর আগেই রাস্তার পাশে পাই প্রকৃতির তৈরী দুটি বড় পাথরের সিস্টার স্টোন। আরোও কিছুটা এগিয়েই প্রসন্ন বিরূপাক্ষ মন্দির - যেখানে বিগ্রহগুলির তলদেশ জলপ্লাবিত। রয়াল সিটাডেলের মধ্যে পাই ক্যুইনস্ বাথ, রয়াল এনক্লোসার, ডানাইকস্ এনক্লোসার, মিন্ট এলাকা, জেনানা এনক্লোসার, হাজারো রামা মন্দির, এলিফ্যান্ট স্টেবল, নোবেল ম্যানস প্যালেসেস।

রাণীর রাজপ্রাসাদের কাছে অবস্থিত মহারাণীর স্নানাগারের পরিকল্পনা বেশ আকর্ষণীয়। রয়াল এনক্লোসারের মধ্যে থাকা মহানবমী ডিব্বা, সূতিগৃহ, জন স্নানাগার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। নবরাত্রি ও দশেরা দেখার জায়গা হল এই ডিব্বা। সূতি গৃহের কিছুটা উত্তরে অবস্থিত হাজারো রামা মন্দিরের অসংখ্য রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানের উপস্থাপনাও বেশ অনবদ্য লাগে। মিন্ট এনক্লোসার ও ডানাইক এনক্লোসারের অবস্থান রয়াল এনক্লোসার ও হাজারা রামা মন্দিরের পশ্চিমে। সাম্প্রতিক খননে ডানাইক এনক্লোসারের আরোও পশ্চিমে মিলেছে সৈন্যদের থাকার ব্যারাক।

জেনানা এনক্লোসারের মূল আকর্ষণ হল লোটাস মহল। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের সংমিশ্রণে সৃষ্টি দ্বিতল পদ্মাকৃতির অন্য নাম চিত্রাঙ্গিনী মহল। কথিত যে রাণীরা উৎসব দেখতেন জেনানা এনক্লোসারের ওয়াচ টাওয়ার থেকে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসস্তুপের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লাগে উওমেনস্ গার্ড কোয়ার্টার ও রাজপ্রাসাদ। ওয়াটার প্যাভিলিয়নের গঠন বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লোটাস মহলের পেছনে পাই এগারোটি গম্বুজ বিশিষ্ট এলিফ্যান্ট স্টেবল। এখানে ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের সংমিশ্রণ চোখে পড়ে। পান-সুপারি বাজার, ধর্মশালা, সমাধিস্থল, বিষ্ণু মন্দির দেখে ফিরে চলি KSTDC গেষ্ট হাউসে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির পর চন্দ্রশেখর মন্দির, গানিগিট্টি, জৈন মন্দির, পিছনের শহরের মূল প্রবেশদ্বাররূপে ভীমা গেট, গণেশ মন্দির একে একে দেখে নিয়ে পৌঁছাই হনুমান মন্দির হয়ে মাল্যবন্ত পাহাড়ের রঘুনাথ মন্দিরে। কমলাপুরম থেকে তালারিগাট্টা সড়কের পূর্বের এই মন্দিরটি বিষ্ণু মন্দিরের উদাহরণ। দক্ষিণে পাঁচতলা গোপুরম সহ পূর্বে তিনতলা অপর একটি গোপুরম। রাম-সীতা মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসা হনুমান ও দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্মণকে বেশ লাগে। অপরাহ্নে মাল্যবন্ত পাহাড়ে বোল্ডারের পাশে পাশে কৃত্রিম রং ও পোশাকে সেজে উঠতে থাকে বালি ও সুগ্রীব। তাদের লড়াই ভ্রমনার্থীদের কাছে যা বেশ আকর্ষণীয়। রামায়নের এই ছোট্ট অংশটি আজও হাম্পি জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করে। গোধূলিতে মাল্যবন্তসহ সমস্ত হাম্পি কমলা রঙে স্নাত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবে যায়। হনুমান ভাই-এর সঙ্গে ধীরে ধীরে পৌঁছে যাই নিজেদের আশ্রয়ে।

সারাদিনের ধকল কিছুটা কাটিয়ে আবার সাক্ষাতে বসি দেশমুখের সামনে। বলি বিজয়নগরের ইতিহাস তুলে ধরার কথা। বিজয়নগর মানে 'সিটি অব ভিক্টরি'। তেলেগু রাজকুমার হরিহর-১ হক্কা ও বুক্কার হাত ধরে ১৩৩৬-এ শৃঙ্গেরী মঠের গুরু বিদ্যাবনের সাহচর্যে গড়ে ওঠে বিজয়নগর রাজ্য। রাজধানী গড়ে ওঠে ১৩৪৩-এ তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ পাড়ে। চার চারটে বংশ রাজত্ব চালায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যে — ১৩৩৬-১৪৮৫-তে সঙ্গম, ১৪৮৫ থেকে ১৪৯১ পর্যন্ত সালুভা, ১৪৯১-১৫৭০-এ টুলুভা এবং ১৫৭১-১৬৪৬ সাল পর্যন্ত আরাবিদু। ১৫০৯ থেকে ১৫২৯-এ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর বিস্তৃতি, প্রশাসন, শিল্প, সাহিত্য, আর্থিক সমৃদ্ধিতে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। আজকের অধিকাংশই রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে সৃষ্টি। আলাপে আলাপে ডিনারের সময় হয়ে আসে। যা কিছু দেখা বাকী রয়ে গেল তা শুরু হবে আগামীকাল সকাল থেকে বলে শেষ করলেন।

পরদিন হনুমান ভাই কিছুটা দেরীতে যাত্রা শুরু করালেন। নাগেশ্বর মন্দির, রঘুনাথ মন্দির, চেন্না হুডিয়ান মন্দির দেখিয়ে পৌঁছালেন পট্টাভিরামা মন্দিরে। অচ্যুতদেব রায়ের (১৫২৯-৪২) হাতে তৈরী মন্দিরটি কিছুটা প্রশস্ত প্রকৃতির অর্থাৎ ছড়ানো, দক্ষিণী শৈলীর প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই রয়েছে এখানে। মিউজিয়মে ঢোকার সময় হয়ে যাওয়ায় অবশেষে পা বাড়াই সেই উদ্দেশ্যে। বিজয়নগরের সিগনেচারগুলো কিছুটা মুক্ত ও কিছুটা আবদ্ধ প্রথাগতভাবে দেখার সুযোগ মিলল এখানে। মুক্ত আকাশের নীচে এমন সাজানো গোছানো মিউজিয়ম ভারতে আছে বলে মনে হয় না। দেখতে দেখতে বেশ কিছুটা সময় পেরোলো — আরোও সমৃদ্ধ হলাম। মধ্যাহ্নকালীন আহারের পর আবার এগোনো শুরু। এবার ধরলাম ASI-এর অফিসের সামনে থেকে সোজা তালারিগাট্টার পথ। বাহন হতে নেমে ব্যাটারি চালিত যানের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পৌঁছালাম বিজয় বিঠলা মন্দির চত্বরের একেবারে সামনে। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে পাকড়াও করলাম একজন গাইডকে, কারণ এবার আমাদের দৌড় শেষ। হাম্পির সবচেয়ে বিশেষত্বপূর্ণ মন্দির চত্বরের মুখোমুখি

আমরা। এও রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত। ভগ্নপ্রায় গোপুরমের মধ্যে দিয়ে গিয়েই প্রশস্ত মূল মন্দির। বিঠলা স্বামী তথা বিষ্ণুর মন্দির, সঙ্গী হল কল্যাণ মন্ডপ ও গ্রানাইট পাথরের রথ। মূল মন্ডপে মনোলিথিক ৫৬টি স্তম্ভের প্রতিটিই নাকি মিউজিক্যাল। পরখ করে দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। দক্ষিণাবর্তে একে একে অন্যান্য মন্ডপ দেখে একেবারে শেষে পৌঁছোই স্টোন চ্যারিয়টের সামনে। তখনও সেলফির জ্বালা না থাকলেও প্রাণ ভরে দেখার সুযোগ প্রায়শই বিঘ্ন হচ্ছিল ফ্যামিলি ফটোশ্যুটের আঘাতে। একমাত্র কাঠগুলুঞ্চই বোধ হয় নীরব সাক্ষী ছিল বিজয়নগরের ইতিহাসের। বিগত দেড়দিন ব্যাপী হাম্পি দেখার মধ্যে সেরার সেরা হয়ে উঠেছিল এই কমপ্লেক্স।

আরো কিছুটা বাকী মনে হতেই দূরভাষে হনুমান ভাইকে মাতঙ্গের তলায় অপেক্ষা করতে বলা হল। বিঠলার বাইরে তুঙ্গভদ্রার তীর ধরে হাঁটার পালা। অদূরের শিবমন্দির, ভেঙে যাওয়া সেতু, কিংস ব্যালান্স, পুরন্দবাদসা মন্টপ, রাম মন্দির, বরাহ মন্দির, কোদন্ড রামা মন্দির, সোলাই বাজার, অচ্যুত রায় মন্দির হয়ে এসে পৌঁছাই মাতঙ্গের পাদদেশে। হনুমানভাই-এর উপস্থিতি নিজেদের কনফিডেন্সকে বেশ কিছুটা বাড়িয়ে তোলে। পাকা রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে শুরু হ'ল মাতঙ্গ পাহাড়ে ওঠার ধাপ। বিদেশী ও বিদেশিনীদের বোধ হয় পছন্দের নয় এ পথ। তাই তারা বোল্ডার থেকে বোল্ডারে ট্রেক ও ক্লাইম্ব করে পৌঁছে যায় পাহাড় চূড়ায়। আমরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দেখি ভাস্কর্যের ভগ্নাবশেষ, এখানে সেখানে ছড়ানো, গায়ে কাঁটা দেয়। এক কফি বিক্রেতা কিছুটা তাড়াতাড়ি উঠতে থাকলেন। মনে হল গোধূলিতে ভ্রমনার্থীদের ভিড় হয় পাহাড় চূড়ায়। অবশেষে পৌঁছে দেখি সামনে অচ্যুত রায় মন্দিরের এরিয়াল ভিউ, অদূরে তুঙ্গভদ্রা — আপন গতিতে বহমান। মৃদুমন্দ বায়ুতে পূরবীর সুর স্নাত করে চলেছে হাম্পিকে। ধীরে ধীরে গোধূলির রাঙা আলোয় হাম্পি সিল্যুয়েটে বন্দী। তার মননের পুরাণ, দেহের অতীত ও ঐতিহ্যে মুক্তি দিতে থাকল আমাদের।

প্রসঙ্গ ভ্রমন

হিউয়েন সাঙ তাঁর ভারত ভ্রমনকালে এলাহাবাদের প্রয়াগ সম্বন্ধে বলেছেন হাজারে হাজারে মানুষ ছুটে আসে এখানে। সাতদিন ধরে উপোস করে, কেউ স্বেচ্ছায় মারা যায় জলে ডুবে। তিনি দেখেছেন, শুধু মানুষ নয়, বানর আর হরিনও হাজির হয় ঝাঁকে ঝাঁকে। স্নান করে তারাও। বারাণসীতে তিনি দেখেছিলেন চারিদিকে শুধু সাধু আর সাধু। কেউ ন্যাড়া, কেউ জটাধারী, কেউ নগ্ন। তিনি এখানে একটি একশ ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ দেখেছিলেন, তামা দিয়ে তৈরী। তিনি লিখেছিলেন দেখলে মনে হয় জীবন্ত দেবতা। একই সঙ্গে ভয় ও ভক্তিতে ভরে ওঠে মন। হিউয়েন সাঙ যখন নালন্দায় এসেছিলেন তখন অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র এবং তখন তাঁর বয়স ১০৬ বছর। হিউয়েন সাঙ ৭৬টি বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি সি-ইউ-কি অর্থাৎ ভারতভূমির বিবরন।

এই বাংলায়

পত্রাঙ্গ বসু

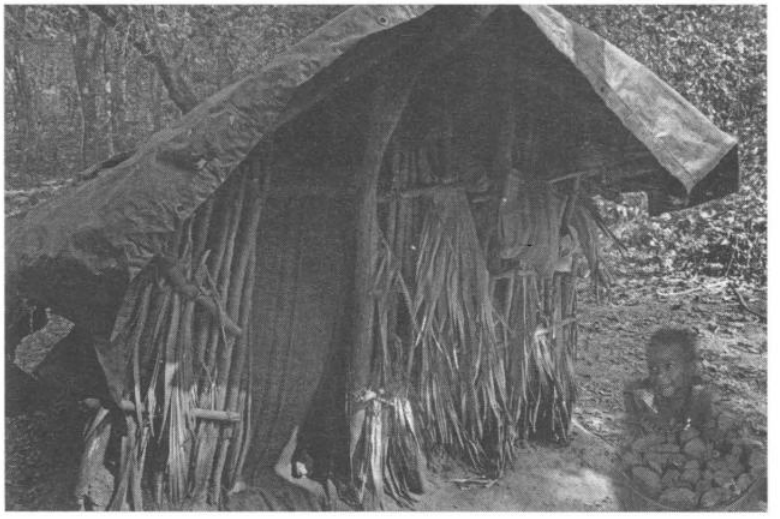

কোদলবনি গ্রাম, পঃ মেদিনীপুর ছবি - লেখক

"আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে, আমি এই ঘাসে বসে থাকি।" সাতটি নয়, সাতশোও নয়, হয়তো বা সাত হাজারো নয় — অসংখ্য অগুণতি তারারা রাতের আকাশে ভিড় করে আছে। আর আমি সত্যিই ঘাসে বসে আছি। এই বাংলায় এক কোণে, এক গ্রামের মাটিতে। এখানে মাথার ওপর কালো মখমলের চাঁদোয়ায় অসংখ্য হীরের দ্যুতি। আমার চারপাশে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘিরে নিকষ কালো অন্ধকার — "মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।" সঙ্গী আমার নির্বাক পৃথিবী।

নীচে চারপাশে অন্ধকার — মাঝে মাঝে মিটিমিটি আলো — ওপরের তারাদের মতো, জোনাকিরা যে জ্বলছেন! আকাশের তারাদের মতোই অগণিত, অসংখ্য। গোনা দায়। চেনা দায় — কোনটা বা তারা — 'স্বাতী নক্ষত্র', কোনটা বা জোনাকি। এই বাংলায়। এখানেই সম্ভব।

এইরকম অসংখ্য গ্রাম। চিড়াকুটি, রিমরাডাঙা, কোদলবনী, বালিচুয়া, লবনি, শাখাভাঙা, ডুমুরকন্দা, ঢাঙ্গিকুসুম। না সব নাম বলা বারণ। কলকাতা থেকে লোকজন যদি হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে। তাহলে নির্জনতা কোথায় থাকবে — 'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন!'

'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।' দিন ফুটলে দেখবেন দূরে পাহাড়ের রেখা। আপনার সামনে ধানক্ষেত। আলপথ। ইচ্ছে হলে একটু হেঁটে দেখুন। পায়ে শিশির লাগান, মাটির স্পর্শ নিন। পাশে পাশে বিদ্যুতের খুঁটি আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। তারে তারে দেখবেন নীলকণ্ঠ নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। ওরা জানে না যে — "বিজলীবাতির তারগুলা ওই জাত আলাদা।" নুড়িপথ ধরে গ্রামের ভেতর হাঁটবেন। গাছগাছালির ভেতর দিয়ে — "ছায়া তখন আলোর ফাঁকে লতার মতো জড়িয়ে থাকে।"

শীতের ভোরে কুয়াশায় মাখামাখি চারিধার। আপনার মনও যদি বিষণ্ণ ধোঁয়াশায় ভরা থাকে; আসন্ন কোন বিচ্ছেদ তীব্র বেদনা জাগায় মনে, তবে আদিগন্ত উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন — "যদি আর কারে ভালোবাসো, যদি আর ফিরে নাহি আসো, তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাই গো।" বলতে পারবেন — "ভালোবাসা অতি ভয়ংকর বস্তু।"

আলপথ ধরে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গেলে দেখা হবে এক নদীর সঙ্গে। শীতকালে শান্ত, স্থির। আপনি তাকে পেরিয়ে যেতে পারবেন অনায়াসে তার বুক চিরে বিনা অনুমতিতেই। কিন্তু বর্ষায় ঘোর সংকট। আপনি বাধ্য হবেন পিছু হটতে। অনুমতি মিলবে না পারাপারের। নদীর ধার ঘেঁষেই পাবেন বাবুই ঘাসের ক্ষেত। যে বাবুই একদিন কাটা হয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে দড়ি হবার জন্য। গ্রামের মেয়ে বউ জোয়ান বুড়ো সবাই লেগে পড়বে ঘরে ঘরে দড়ি বানাতে বাবুই ঘাস থেকে। কখনো দুই মানুষের

হাতে হাতে, কখনও উঁচু গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে, কখনো বা মেশিনে পাকানো হবে দড়ি। সেই দড়ি পৌঁছে যাবে শনিবারের হাটে। বিকিকিনির জন্য।

গ্রামের অদূরেই রাস্তার প্রায় ধারেই দেখতে পাবেন পাথরখাদান। বিরাট পাথরের চাঁই। ছেনি হাতুড়ির ঘায়ে একটু একটু করে ভাঙা পড়ছে — গড়ছে নুড়ি পাথর। গাঁয়ের জোয়ান পুরুষ মায় মহিলারাও আছেন এ কাজে। কঠিন পরিশ্রম। তবু দিনশেষে কিছু তো রোজগার!

আরো হেঁটে গ্রাম ছাড়িয়ে গেলে পাবেন জঙ্গল — রকমারি গাছ। রকমারি পাখি। আমরা পরিযায়ী পাখি দেখতে ছুটি, সব কাজ ফেলে প্রাণ আকুলি বিকুলি। কিন্তু ঘরের পাশেই যারা রোজ গান গায়, ঘুম ভাঙায়? জীবনে জড়িয়ে থাকে পরম উষ্ণতায়? পাবেন মহুয়া — গাছেতে যেমন, মাটিতেও অনেক। একটু এগোলেই বিশাল পুকুর —লাল শালুকে ভর্তি। চারপাশে সবুজ ঘাসের গালিচা, সবুজ গাছ। সবুজ ঘাস, সবুজ লতাপাতা। আপনার সবুজ মন খুঁজবেই কাউকে। মন বলবে — ''হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়।'' তারপর পুকুরের জলে পা ডুবিয়ে বসুন। দূরের নীলকণ্ঠ আপনার ওপর নজর রাখবে। চুপ করেই বসে থাকুন। কারণ গোটা পৃথিবী আপনার চারপাশে নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ; যেন ধ্যানমগ্ন, আত্মস্থ। নিজেকে উপলব্ধি করুন। নিজেকে চেনবার চেষ্টা করুন। জানবার চেষ্টা করুন কেন এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি। কেনই বা রয়েছে এই ফড়িংগুলো এই মুহূর্তে আপনার চারপাশে, ঘাসের আগায়। উচাটন মন ক্ষাণিক শান্ত হবে।

গ্রামের ভেতর যদি উঁকি দিয়ে দেখতে চান দেখবেন — আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনযাত্রা — মাটির বাড়ি, মোটা দেওয়াল, নিকোণ উঠোন, একধারে তুলসী মঞ্চ, এককোণে মাটির উনুন আর একধারে ধানের গোলা, গোরুর গাড়ি। গোয়ালঘর আর একদিকে। মায়েরা ব্যস্ত হাজার কাজে। পরম যত্নে লালন করে, পালন করে নিজের সন্তানের সঙ্গেই ছাগলছানা, শুকরছানা, গরুর ছানা, মুরগির ছানাদের। সকলেই যে তাঁর সন্তান। কোন ভেদ নেই মানুষে আর পশুতে।

নারীর সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগ। একে অন্যের পরিপূরক। নারীকে অন্তরের শক্তি দিয়েছে, সহনশীলতা দিয়েছে, সংবেদনশীলতা দিয়েছে প্রকৃতি। নারীও তাই পরম যত্নে পালন করে প্রকৃতিকে — এইখানে। নারী সৃষ্টি করে। ধ্বংস করা তার কাজ নয়। গ্রামে গ্রামে তাই নারী সেই সৃষ্টির কাজেই নিমগ্ন।

গ্রামের মাঝে মাঝে দেখতে পাবেন শবরদের ঘর। কেথাও বা আট-দশ ঘরের শবর কলোনি। আর্থিক অবস্থার পার্থক্য সাদা চোখেই ধরা পড়বে আপনার কাছে। অনেক ঘরেই ঢোকার জন্য পাবেন না কোন দরজার বাধা। পুরনো ছেঁড়া ময়লা মশারি বা কম্বল দরজায় টাঙানো।

ঘরের ভেতর নিকষ অন্ধকার। কোন ঘরের আবার দেওয়াল বলে কিছু নেই। গাছের ডাল কেটে পাশাপাশি পুঁতে তাকে ঘরের চেহারা দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু হা-হতোস্মি। কোথায় কী। বাইরের দৃশ্য পুরোপুরি দৃশ্যমান। বাতাসের অনায়াস যাতায়াত ঘরে-বাইরে। ওই 'ঘরে' গভীর শীতে রাত কাটানো? অসম্ভব। কেবল সম্ভব আগুন জ্বেলে সারারাত শরীর গরম রাখা। কিন্তু কতক্ষণ?

শবররা অতি প্রাচীন মানবগোষ্ঠী। মহাভারতেও শবরদের অস্তিত্ব আছে। চাষের কাজ জানে না। নিজস্ব জমিও নেই। কেবল বনের ওপর নির্ভরশীল। বন থেকে জ্বালানী কাঠ, পাতা সংগ্রহ করে জীবিকা। বন ধ্বংস করে নয়। বনকে রক্ষা করে। সে পদ্ধতি তাদের জন্মগত বিদ্যা।

ব্রিটিশ আমলে শবরদের ওপর অত্যাচার নেমে এসেছিল। শবরদের ব্রিটিশ সরকার 'ক্রিমিন্যাল' আখ্যা দিয়েছিল ''দ্য ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট ১৮৭১'' প্রয়োগ করে। তাদেরকে এই আইনের ধারাবলে স্বভাব ক্রিমিন্যাল বলে গণ্য করা হোত। তাদের চলাফেরার ওপর ছিল নিষেধাজ্ঞা — যেখানে খুশি তারা যেতে পারতো না। পরিবারের পুরুষদের নিকটবর্তী থানায় প্রতি সপ্তাহে হাজিরা দিতে হোত। এমনকি শবরদের পরিবারে শিশু জন্মালে সেই শিশুও ক্রিমিন্যাল আখ্যা পেত — এমনই ছিল সেই আইন। অর্থাৎ শবররা বংশ পরম্পরায় 'ক্রিমিন্যাল'। ভাবুন একবার। শবরদের ছিল হাতের কাজের দক্ষতা। নিপুণ হাতে অস্ত্র বানাতে পারতো; পারতো দক্ষ হাতে লোহা দিয়ে বানাতে বিভিন্ন কলকব্জা। এ হেন শবরদের ব্রিটিশরা ভয় পেয়েছিল।

শবররা আজ কষ্টে দিন কাটায়। কোটাল শবর। পরনে লুঙ্গি, ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার বাড়িতে মশারি নেই। তাই ম্যালেরিয়া হয়। কম্বল নেই তাই শীতে কষ্ট পায়। কোটালের বউ কোথা থেকে যেন একটা কম্বল আর মশারি জোগাড় করেছিল। কিন্তু গত বছর বউটা মারা গেছে। কোটাল বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে মশারি কম্বলটাও মাটি চাপা দিয়ে দেয়। বলে, ''কী হবে? মানুষটাই নেই।''

শবরদের কেউ হয়তো মশারি দিয়েছিল। ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচবার জন্য। কিন্তু তারা মশারি না টাঙিয়ে জলে ফেলে মাছ ধরতে লেগেছে। খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তো। আর বাঁচলে তবে না ম্যালেরিয়া! অকাট্য যুক্তি। সরকার থেকে ছাগল দিয়েছে। বাড়ি পৌঁছোনোর আগেই তা বিক্রি করে দিয়েছে। সরকার থেকে জমির পাট্টা দিয়ে, সেই জমিতে পাকা ঘর বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পর আবিষ্কার করা গেল বাড়ির লোহার দরজা জানলাগুলো নেই। প্রশ্ন করতে সহজ উত্তর পাওয়া গেল 'ঝড়ে উড়ে গিয়েছে।' শহুরে বাবু দেখলেই সেই যে ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে যায় বার করে কার সাধ্য। অন্ধকার ঘরে সেদ্ধ হয় গেঁড়ি-গুগ্‌লী — মধ্যাহ্নভোজ হবে যে। কোন কোন দিন খেজুর গাছ থেকে মেঠো ইঁদুর ধরে এনে

পুড়িয়ে নিয়ে চলে ভোজ। বাচ্চাদের হাতেও সযত্নে ধরা দেখবেন মরা ইঁদুর; পোড়াবার অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আগুনের পাশে, মায়ের কাঁধে হাত রেখে।

শনিবার গভীর রাতে শবরদের বাড়িগুলো থেকে চিৎকার শোনা যায় — প্রথমে পুরুষকণ্ঠ, তারপর নারীকণ্ঠ; এরপর ক্রমান্বয়ে পুরুষ ও নারী; শেষে পুরুষ ও নারী একযোগে। শনিবার। শনিবার হাটবার। কারণ হাটবারে হাটে সহজে মহুয়ার মদ প্রচুর মেলে। পরের দিন সকালে দেখা যায় কারো মাথা ফাটা, কারো চোখের তলায় কালসিটে; কারো বা হাতে পায়ে ক্ষতচিহ্ন। অর্থাৎ কাল রাতের পারিবারিক ঝগড়া নেহাতই নিরামিষ ছিল না। দিন বাড়লে আশেপাশের গাছতলাগুলোতে দেখতে পাওয়া যাবে নারী পুরুষের বেহুঁশ শরীর। তাদের আশেপাশে অবিন্যস্ত, ধুলোয় সাদা হয়ে যাওয়া, অপরিষ্কার, জট লাগা একমাথা ঝাঁকড়া চুলওয়ালা বাচ্চারা খেলা করছে। পরনে তাদের না কেচে কালো হয়ে যাওয়া শার্ট প্যান্ট। এই বাচ্চারা স্কুল যায় না।

তবু জীবন চলে। এই মানুষগুলোই আবার উঠে দাঁড়ায়। জীবনধারা বয়ে চলে। প্রেম-ভালোবাসা-সন্তান, পরবে আমোদ, আমোদে মহুয়া সবই চলে। আর মহুয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে এ জগৎ থেকে ক্ষণিক নিজেকে সরিয়ে নেওয়া — জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নয় — এও যেন এক জীবনবোধ। জীবনদর্শন। দুর্জয় সাহস বুকে — কাল কী হবে জানা নেই। তবু ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়া নেই। শান্ত ধৈর্যপূর্ণ দিনযাপন। কোন অভিযোগ নেই। প্রতি পলে মুহূর্তে ক্ষণিক নিজের অজান্তেই জীবনপাত করে এ পৃথিবীর সম্পদ প্রকৃতি পাহাড় বনকে রক্ষা করে চেলেছে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে। এই-ই যেন শবরদের জীবন-উদ্দেশ্য। তাদের উপকার করতে যাবার স্পর্ধা নেই। সম্মানটুকু যেন করতে পারি।

এইরকম গ্রামের পর গ্রাম। দুধারে ধানের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া আঁকাবাঁকা পিচ রাস্তা আপনাকে পৌঁছে দেবে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া হয়ে পুরুলিয়া। কোন গ্রাম পাথরশিল্পীদের, কোন গ্রাম পটচিত্র শিল্পীদের, কোন গ্রামে বাড়ির দেওয়ালে আঁকা বিচিত্র চিত্রকর্ম। কোন গ্রামে আবার পাবেন বাঁশ দিয়ে, খেজুর পাতা দিয়ে তৈরী ব্যবহার্য জিনিস — মাদুর, টুপি, কলমদানি সেইসঙ্গে শিল্পকর্মও।

এইসব গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে এটা মনে হয় যে এখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি আর পশুপাখিদের আত্মিক যোগ রয়েছে। মানুষ যেমন প্রকৃতিকে আগলে রাখে প্রকৃতিও তেমনি মানুষকে। দিনের সূর্য, রাতের চাঁদ-তারারা খুব কাছে থেকে এই মানুষদেরকে নজরে রাখে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই মানুষদের প্রতিষ্ঠা করে দেয় তাদের নিজস্ব জায়গায়। আর তাদের সংস্কৃতি নিয়ে, আচার নিয়ে, গড়ে তোলে জীবনবোধ। এই জীবনবোধ জীবনদর্শন শহুরে কলকাতার মানুষের জীবনদর্শন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

কলকাতা ফিরে মনে হয় জীবনের আসল রূপ পাওয়া যায় এইসব গ্রামেই। এই গ্রামগুলিতে পৌঁছতে হলে ঝাড়গ্রাম অথবা ঝাড়খন্ডের চাকুলিয়া স্টেশনে নেমে সড়কপথে বেলপাহাড়ি পৌঁছতে হবে। বেলপাহাড়ি থেকে ট্রেকার অথবা নিজস্ব যানের ব্যবস্থা করে পৌঁছতে পারবেন চিড়াকুটি রিমরাডাঙ্গা ওদলচুয়া ইত্যাদি গ্রামে। পৌঁছে যাবেন এই বাংলার জীবনযাত্রার আকরে।

(উদ্ধৃতি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাস, পাওলো কোয়েলো)

লেখকদের প্রতি

'গণ্ডীছুট' পত্রিকায় ভ্রমণ সম্পর্কিত লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল। -

- এ-ফোর মাপের কাগজে এক পিঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে উপযুক্ত মার্জিন এবং দুটি লাইনের মাঝে উপযুক্ত ফাঁক রেখে লেখা পাঠাবেন।
- লেখা ১০০০ থেকে ১২০০ শব্দের মধ্যে হওয়া কাম্য।
- অনুরোধ লেখার জেরক্স বা কার্বন কপি পাঠাবেন না।
- লেখকের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর অবশ্যই লিখবেন। ই-মেল থাকলে জানাবেন।
- লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখবেন।
- ছবি থাকলে সিডি অথবা পত্রিকার ই-মেলে পাঠাবেন।
- ছবি ৩০০ ডি পি আই রেসোলিউশনের হতে হবে। প্রিন্ট ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে ক্যাপশন পাঠাবেন অবশ্যই।
- লেখা ও ছবি পত্রিকার ই-মেলে (অ্যাটাচ করে) বা নীচের ঠিকানায় পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ
সম্পাদক
ড. হরিসাধন দে অধিকারী
বি-৬/৮৭,
কল্যাণী, নদীয়া,
পিন - ৭৪১২৩৫
ই-মেল ঃ
gandhichhut@gmail.com
harisadhan.deadhikari@gmail.com

বৃক্ষনাথের কোলে

চন্দন চক্রবর্তী

ছবি - লেখক

চলেছি গালুডি থেকে ভালোপাহাড়। ঘরোয়া এলোমেলো স্টেশন। প্লাটফর্ম বলে কিছু নেই। স্টেশন চত্বর থেকে গাড়ি ধরে এগোতে লাগলাম। হঠাৎই মনে পড়ল ছোটবেলার কথা। গ্রাম থেকে শহর-কলকাতার পথে। লরির সামনের সিটে বসে। ড্রাইভারটি হঠাৎ বলেছিল, 'ওই দ্যাখো ওটা কলকাতা'। কলকাতায় তখন বৃষ্টি পড়ছিল। আর আমাদের দিকটা মেঘে ঢাকা ছিল। গালুডি স্টেশন থেকে রওনা দিয়ে যখন ঝাড়খণ্ড ছাড়িয়ে পুরুলিয়া ঢুকছি তখন ওদিকে মেঘলা আকাশ আর এদিকে মিন মিনে রোদ ছিল। 'আসনপানি' জায়গাটার নাম। সর্বদা ফিস ফিস করে বলে চলেছে 'মাটি জল বাতাস গাছপালা পাখি আকাশ সব এক'। কিন্তু তোমরা আলাদা। তুমি বাংলা তুমি ঝাড়খন্ড। সুন্দর নিকনো আদিবাসীদের ঘর। দেওয়ালে সুন্দর আলপনা। গরু-ছাগল মুরগি ছানা চরে বেড়াচ্ছে ঘরের উঠোনে। কিছুটা যাবার পরই পাহাড়ের হাতছানি। দূরে সবুজ টিলা। রাস্তার ডানপাশ বরাবর খাদ। পাহাড়ি বালি চিকচিক নদী। নদীটাকে খামচে খুমচে বিধ্বস্ত করেছে বালিচর, পাথর খন্ড। জলবিহীন অভাগা, তবুও সে নাম না জানা এক নদী শুয়ে রয়েছে এক রাশ আশা নিয়ে। 'কবে পরিযায়ী পর্যটক এসে দেখবে'? মন থেকে উড়ে গেল কথাটা। 'ভালো থেকো নদী'। এগোতে থাকি, রাস্তার বাঁকে বাঁকে অরণ্য-পাহাড় রহস্য লুকিয়ে। লুকোনো রহস্য ভাঙতে ভাঙতে পৌঁছলাম দুয়ারসিনীতে।

অদ্ভুত সুন্দর নাম। নামের মধ্যে একটা সোঁদা গন্ধ। এ গন্ধে মাদকতা আছে। সেই মাদকতার টানে নেমে পড়লাম। রাস্তার বাঁকেই দুয়ারসিনীর মন্দির। মন্দির বলতে ভেতরে কালো পাথর। সিঁদুর ফুল বেলপাতা আর ধূপের ছাই-এর চড়ুইভাতি। ফুল ঠাকুরের আশ্রয়ে যায় যখন, তখন বোধ হয় একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। এক বুক গন্ধ নিয়ে পেছনের গাছপালা ঝোপঝাড় পেরিয়ে একটা জলশব্দকে কানে নিয়ে এগোতে লাগলাম।

সাদা অজস্র এদোড় বেদোড় পাথর। স্বচ্ছ টলটলে জল আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শব্দ করছে। পাথুরে শব্দে রয়েছে বেদনা, যন্ত্রণা। এখানেও নদী শীর্ণা। যেন কেন্দুফল খাওয়া আদিবাসী মেয়ে। অনেকদিন ভালমন্দ কিছু জোটেনি। এক বুক দীর্ঘশ্বাস - 'ও পাহাড়, গাছ ও বৃষ্টি বল না, কেন নদীরা শুকিয়ে যাচ্ছে?' ওরা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে 'নিজেকে প্রশ্ন কর রে কবি'।

একটা ছোটখাট হাট বসে এখানে। বিকেলে হাট। দুপুর থেকে তার প্রস্তুতি চলছে। সজনী বসে রয়েছে ঝুপড়ি মঞ্চে। তিনদিক খোলা, মাথায় খড়ের চাল, বাতার বেঞ্চ পাতা। গেলাম আমরা। শহুরে সুন্দরী নয় সজনী। তবুও তার গ্রাম্য আদিবাসী রূপের মধ্যে একটা গভীর টান আছে। বেশ লম্বা মেদহীন শরীর। বুকের ভাঁজে রয়েছে যাদুর স্পর্শ। জীবনে হাড়িয়া খাইনি। ওর টানে আমি, ঋত্বিক বসে পড়লাম। সঙ্গে মটর সেদ্ধ পেঁয়াজ কুচির চাট। ঋত্বিক বলল, 'শরীর ঠাণ্ডা হবে আর হালকা লাগবে নিজেকে, খেয়ে নাও'। সজনীকে নিয়ে ভারি আরও ভারি হতে চাইলাম। হল কই? ওদিকে দেখি মোরগের লড়াই-এর মহড়া চলছে। কালো কুচকুচে পালক ঢাকা, লাল ঝুঁটি ফুলিয়ে ওরা ঝাঁপাবার জন্য প্রস্তুত। বেরোবার সময় দেখলাম একজন আদিবাসী যুবক গাঢ় দৃষ্টিতে দেখছে। মাথায় লাল গামছা বাঁধা। মোরগের লাল ঝুঁটির মত। মুচকি হেসে তাকালাম। ভাবটা, 'ধুর পাগল যা ভাবছিস তা নয়। বনসুন্দরীকে বনেই মানায় রে পাগল। তোরা ঈশ্বরের সন্তান। তোদের গায়ে বনজগন্ধ লেপটে। তোরা

গাছ ভালোবাসিস। তোরা এসব রেখেছিস বলেই পৃথিবী এত সুন্দর এখানে। সজনী বা তুই এত সুন্দর। চলি রে ...'

গাড়িতে উঠলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বৃক্ষনাথ এর আখড়ায় অর্থাৎ ভালোপাহাড়ে। যদিও পাহাড় নেই আশেপাশে, আছে সবুজ বনানী ঘেরা। সত্যিই 'পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষের জন্য প্রার্থনা'রত একটা আশ্রম যেন। বৃক্ষনাথ আশ্রম'। গেস্ট হাউসই বলা ভালো। আগে থেকে বুক করেছিল ঋত্বিক। দোতলার পর পর কয়েকটি ঘর। দুটো ঘরে রয়ে গেলাম আমরা।

ভালোপাহাড় সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়। এই রুখু সুখু বন পাহাড়ির টানে, প্রকৃতির টানে, চলে এসেছিলেন সেই সুবর্ণরেখার ধারে দলমা পাহাড়ের পাদদেশ ছেড়ে। সেই ঋষিপুরুষই শিখিয়েছিলেন 'এই বৃক্ষরাজি সবই ঈশ্বর। এঁদের পুজো করো। ফল পাবে'।

এখন এখানে লক্ষ লক্ষ গাছ রোপন হয়েছে। বিশাল জায়গা নিয়ে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রচুর সবজি খেত, পুকুর। গোয়াল ভরা গরু ইত্যাদি — কত কত আশ্রমিক স্কুলের পোশাক পরেই স্কুল বাসে করে স্কুলে যাতায়াত করে। একরাশ হাসি এইসব ঈশ্বর-সন্তানদের মুখে আর সেই বৃক্ষনাথ-এর ঋষির মুখে। তিনি আর কেউ নন কমল চক্রবর্তী মহাশয়। দেখা হলো না। দেখা হল তাঁর সঙ্গে। যিনি এসব দেখাশোনা করেন - এক ম্যাডাম-এর সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই মনে হল এঁকে কেন সবাই ম্যাডাম বলে? 'জননী' বললেই তো পারে। যেই ক্লোরোফিলের গন্ধ হাসি ছড়ানো মহিলা খাওয়ার সময় খেতের সবজি আর মাছের পাতলা ঝোল দেখিয়ে বললেন, 'এখানে কিন্তু হোটেলের খাবার পাচ্ছেন না তবে ঘরোয়া এবং আশ্রমিকেরা যা খায় তাই।'

পরের দিন চলেছি আমরা। পাইলটবাবু সেই অমিত। হাসিখুশি কমবয়সী ছেলে। গালুডিতেই অনেকদিনের বাস। বৃক্ষনাথ আমাদের ভর করেছে। বৃক্ষরা সব হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাছাকাছি জঙ্গল বলতে 'বুড়িগোড়া'। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। লক্ষ লক্ষ বৃক্ষঈশ্বর দাঁড়িয়ে। সকালের মিঠে রোদ আর মৃদু বাতাস তাদের পুজো করছে। যে পুজোতে নেই ধূপ, ফুলের গন্ধ। নেই শঙ্খধ্বনি, পাখিদের পিউ পিউ স্বরই তাদের পুজোর মন্ত্র। হলুদ, সাদা, লাল বিভিন্ন জংলি ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে গহনবনের মিঠে গন্ধ। শুকনো পাতা বা ডালপালা পোড়ানোর শব্দ হচ্ছিল। অমিত ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'চুপ'! শব্দ করবেন না। বুড়িগোড়ার জঙ্গলের গাছেরা বড় অভিমানী। ওরা কথা বন্ধ করে দেবে'। একটা অদ্ভুত শব্দ! সত্যি গাছ কথা বলে চলেছিল।

মাথায় পাগড়ি মাঝবয়সী হেম মাহাতোর সঙ্গে জঙ্গলের ভিতরেই দেখা। অদ্ভুত কথা শুনিয়েছিল সেই পাগলাটে লোকটি — 'গাছেদের দেখতে আসছিলাম'। সে এক এক করে সবুজ গাছেদের পরিচয় করাল - উটা পিয়াল, উটা শাল, কেঁদ, ভালাই, পাকুড় সিধা - আরও কত কত বৃক্ষনাথ দাঁড়িয়ে। জুটে গেল মুকুল কর্মকার। গাছে ঝুলে থাকা সবুজ সুপারির মত ছোট্ট ছোট্ট গোল গোল ফল দেখিয়ে বলে, ওগুলা কেঁদ ফল। বাড়ি গোঙ্গামান্না গ্রামে। তাকেও নাকি এই বুড়িগোড়া চুম্বকের মত টানে। পাতার বাহার সবুজের তারতম্য নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মনে মনে গহীনবনের বৃক্ষরাজিদের বলি 'ভাল থেকো'।

দু'পাশে অরণ্যানির ভীড়। শুনশান পিচ রাস্তা ধরে এগোচ্ছি শুধু টায়ারের একটানা সড় সড় শব্দ। আমরা দু'চোখ ভরে প্রকৃতি কন্যাকে চুমু খাচ্ছি। বান্দোয়ানের রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম টটকো নদীর (কংসাবতীর শাখা নদী) ওপর তৈরি পরিত্যক্ত লড়ঝড়ে একটা ড্যামে। ঠিক পারগেলা গ্রামের কোলে। কতদিন আগে বিয়ে হয়ে আসা, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, লাঞ্ছনা সহ্য করা এক নারী যেন শুয়ে রয়েছে। ঝাঁজি জলজগুল্ম চেপে বসেছে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া বিশাল ঝিলের ওপর। ধর্ষণ করছে প্রকৃতির দল। কিছু পানকৌড়ি। সাদা বক উড়ে বেড়াচ্ছে। ডানার ঝাপটায় প্রতিবাদের শব্দ। ড্যামের লক গেটগুলো সব অচল। দু'পাশে তেমন জল নেই। দৈত্যের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

বড় কষ্ট বুকে নিয়ে চলেছি। এখানের জলাশয় মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তারা সত্যিই যেন কষ্টের পৃথিবীতেই চলে যাচ্ছে। প্রার্থনা করি 'হে বৃক্ষনাথ এদের বাঁচাও'।

চলে এলাম কুইলাপালের জঙ্গলে। ছায়া রোদ মেঘের সঙ্গে দিব্যি আছে জঙ্গলের গাছপালা। বিশাল একটা ব্রিজ। মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ঋত্বিক ছবি তোলা শুরু করল। 'পাগলটা যে কী দেখে কে জানে'? প্রায় মৃত একটা নদী। পাথর খণ্ডের কাছে নতজানু হয়ে থাকা একটা শুখা নদী। সেখানেই কমবয়সী ছেলেরা স্নান সারছে। কিছু গ্রাম্য মেয়ে ভীষণভাবে চেষ্টা করছে শরীর ডোবাতে। 'জল, এই জল দে না শরীরটা ভিজিয়ে'। নদীর নাম যমুনা-জোড় নদী। বড়কলা গ্রামের বলরাম কর্মকার বলল, পশ্চিম মেদিনীপুরের কাঁকড়াঝোড় পাহাড় থেকে আসছে নদী। বর্ষায় নাকি টইটম্বুর গর্ভবতী গাভির রূপ নেয়।

ঝুপসি শীত-সন্ধ্যায় বসে ছিল বাচ্চা পড়ুয়া ছেলে মেয়ের পাঠপর্ব। আলোয় তেমন জোর নেই। অথচ আদিবাসী বাচ্চাগুলো ভালোপাহাড়ের উঠোনে বসে পড়ছে, লেখাপড়া করছে। বর্ণপরিচয় থেকে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান। সামনের চেয়ারে বসে মাতৃময়ী ম্যাডাম। কিছুক্ষণের জন্য আমরা মাষ্টারমশাই হয়ে গেলাম। মন্দ লাগল না। কত স্মৃতি উসকে দিচ্ছিল - সেই গ্রামের বাড়ির লম্বা উঠোনে হারিকেনের আলোয় দাদা দিদিদের সঙ্গে বাচ্চা আমি মাথা দুলিয়ে পড়ে চলেছি। আলোয় কালো ঝুল জমা হচ্ছে, চোখে ঘুম চলে আসে। দূর থেকে ডায়মণ্ড টকিজের নাইট

শো-এর গান ভেসে আসে 'বসন পরো মা ....।' ব্যাস আমাদের ছুটি। মায়ের ডাক 'এই তোরা খাবি আয়'। মনে মনে ভালোপাহাড়ের এই সন্ধ্যা রাতকে ধন্যবাদ দিই 'আমার সেই ভুলো যাওয়া সময়কে ফিরিয়ে দেবার জন্য'।

গদাধর গড়াই দুটো পাঁচশ টাকার নোট দেখিয়ে বলল, 'কচ্যার খেলনা গো। সরকার ওগুলা খেলনা নোট বানি দিচ্ছে - হা হা চা দে রে রাজু'। শীত সকালে গরম চায়ের টানে বেশ কিছুটা হেঁটে চলে এসেছি। কুচিয়া গ্রামের চায়ের দোকান। লোকটি বসতে দিয়ে বলল, 'যতদিন খুচরা আছে ততদিন খাবো, তারপর হরিমটর'।

চা-এর সঙ্গে গরম সিঙ্গাড়া, চপ, আহা তোফা। রাজু লোকটা স্ত্রীর হাতে সব বুঝিয়ে দিয়ে দৌড় লাগালো। বলল, 'ব্যাঙ্কে যাচ্ছি লাইন দিতে, যদি কিছু পাই'।

তবুও ওরা শান্তিতে আছে। বৃক্ষনাথের দেশে এখন বারুদের গন্ধ আর নেই। ফিরছিলাম ভালোপাহাড়ে। বদল টপড়া চেনালো 'ভালুক শক্তি' গাছ। ম্যাডাম বিশাল গোয়াল ঘরের সামনে। ৩৪টা গরু চরছে চারণভূমিতে। তাঁর সাথেই হাঁটা লাগিয়ে ফিরছিলাম বৃক্ষনাথের গেটের দিকে। উল্টোদিকেই এই চারণভূমি, গোয়াল, পুকুর খেত। এবারে তিনি চেনাতে শুরু করলেন বৃক্ষরাজিকে। হঠাৎই মনে হল অবাধ্য ঝলমলে গাছগুলো শান্ত হয়ে গেল। শুধু মৃদু বাতাসে তাদের পাতা কাঁপে। চুপচাপ-দেশের গাছ যেন। আবদার করে মায়ের কাছে 'আদর করো।' উনি পাতায় হাত বোলালেন, বলে যান - ওটা চেরি, ওটা কফি, ওটা শিরিষ আর আর ওই গাছটা মেনজুরি দেখতে অবিকল শিরিষের মত তাই না? বললাম, বাবা এত গাছ চেনেন? ম্যাডাম হাসেন। 'শুধু চিনি না। এগুলোকে ছোট বয়সে এনে লাগিয়েছি। বলে চলেন ওই দেখুন জামরুল, সীতাহার, হিমজুরি, সিলভার ওক, গোলমরিচ আর ওটা হাসনুহানা, মধুমালতি, বটলব্রাশ ... কত কত গাছ। রোজ চেয়ে থাকে একটু জল, বাতাস আর রোদ্দুরের জন্য। বললাম, 'আর জননীর আদর'? বললেন, 'উঁহু, জননী নয় মেয়ে'। জিজ্ঞেস করি। 'কিন্তু এ মেয়ে কোথা থেকে এল? তার পরিচয় জানা হল না যে'। এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনাদের গাড়ি সকাল দশটায় বলা আছে। তৈরি হয়ে নিন'। 'কিন্তু উত্তরটা পেলাম না যে'।

'এই পাহাড়, জঙ্গল গাছগাছালির মেয়ে আমি। এর থেকে বড় পরিচয় আমার জানা নেই। কোন্ মেয়েবেলায় মেয়েলি খেলা খেলতে খেলতে আটকে পড়েছি। এরা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, এ অদ্ভুদ ভালোবাসার জনেদের ছেড়ে আর বেরোতে পারিনি'। দোতলার বারান্দার পাশেই বিশাল মাঠ। সেখানে চলছে বাৎসরিক ফুটবল প্রতিযোগিতা। সব আদিবাসি ছেলেরা খেলছে। মুর্মু, গড়াই

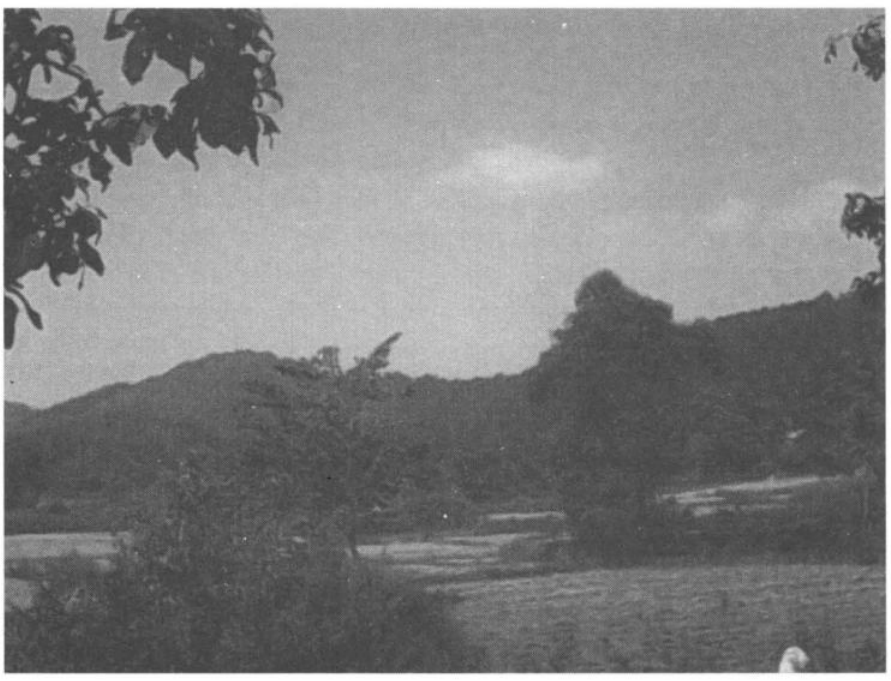

ছবি - লেখক

মাহাতো, টপড়া এরা দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে। বল নিয়ে দৌড়চ্ছে, মনে হলো না শহুরে ছেলেগুলোর থেকে কোনও অংশে কম। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম। ভাবছিলাম 'এরা কি কখনও ভারতের, নিদেনপক্ষে বাংলার জার্সি পরে খেলতে পারবে? উত্তর হাতড়াই ....'

এখন আমরা বন পাহাড় হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছি। নাম না জানা কত কত টিলা পাহাড় ক্রমাগত বুকে আঁকড়ে ধরছে। দুয়ারসিনির ঠিক আগের মোড় থেকে বাঁ দিকে বেঁকে গেল অমিতের গাড়ি। বলল; 'চলুন পাহাড়ি রাস্তা ধরে। এ নির্জন পাহাড় খাদের রাস্তা সবার জন্য নয়। তাছাড়া ধারাগিরি হয়ে গালুডি সাড়ে পাঁচটার আগে পৌঁছতে হলে এটাই শর্টকাট রাস্তা।' পাহাড়ের নামে গ্রামের নাম। 'ঝাঁটি পাহাড়' ডিঙোনো গ্রাম, 'ঝাঁটি ঝরণা'। যেন মন-ঝরণা গ্রাম। পাহাড়। মনকে যেমন ছোঁয়া যায় না, অনুভবে পেতে হয়। ঠিক এই ঝরণা মাখা গ্রাম। অথচ পাহাড়ে ঝরণা নেই। আদিবাসী গ্রাম পেরোন মাটি মাখা 'অধিবাসী' গ্রাম। গ্রাম রাস্তা পেরিয়েই আবার পাহাড়ি রাস্তা। দূরে সবুজ সবুজ টিলা পাহাড়। মাঝে বিশাল খাদ। খাদ থেকে আসছে আদিম বনজ গন্ধ। সবুজ ভেলভেট মোড়া অরণ্যানি। রাস্তার ধারে ধারে বুনোফুল, যেন সেই দুয়ারসিনির সজনী বলে মেয়েটি বুনো তেউড়ি গাছ ঢেকে দাঁড়িয়ে। সহস্র সজনী। গ্রামের নাম আম ঝরণা। দূরের টিলা পাহাড় রোদের ওম গায়ে মাখছে। অমিত বলল 'ওগুলো আমঝরণা পাহাড়'। অথচ কোথাও আম গাছ তেমন দেখলাম না। রাস্তার বাঁকে বাঁকে চমক। কোথাও সুন্দর সুন্দর বুনোফুল। রামধনু রঙে উঠে আসছে গহীন অরণ্য থেকে। কোথাও বা রঙিন প্রজাপতি। এত রঙ, এত রূপ। লাল ফড়িং এর দল বিন্দাস উড়ছে।

পৌঁছে গেলাম ধারাগিরি। মেন রাস্তা থেকে ডানদিকে বেশ কিছুটা সরু গ্রামের রাস্তা ধরে এগোল গাড়ি। একটা জায়গায় থেমে গেল। সেখান থেকে হাঁটা। জঙ্গল, পাথুরে রাস্তা। ভেজা ভেজা পাথর খণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ঝরণার জলের কুল কুল শব্দ। পাতা কাঁদছে বাতাসে। রোদ জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে শুখা নদীকে আদর করছে। আর চুপ ছুপ শব্দ। শব্দের টানে এগোতে লাগলাম। এক কিলোমিটার ট্রেক রুট বলা যায়। দুপুরে শুধু জঙ্গল, জল পাহাড়ের শব্দ। মাঝে মাঝে চেনা অচেনা পাখি। এভাবেই পৌঁছে গেলাম 'ধারাগিরি' ঝর্ণার সামনে। উঁচু থেকে সুতোর মত ছরছর করে জল পড়ছে পাথর ঘেরা কিছুটা অংশে। জলও বিশেষ পরিষ্কার নয়। হঠাৎ শব্দগুলোর করুণ আর্তি শোনা গেল, 'এ অরণ্য, এ ঝরণা গাছপালা নদী পাহাড় সব তোমাদেরও, আমাদের বাঁচাও।'

এতো ফেলে আসা বৃক্ষনাথের আহ্বান ঃ সেই আহ্বানে সাড়া দিতে ইচ্ছে করে। চার অরণ্যচারী চলেছি অরণ্য পথ ধরে। ভেবে চলেছি এভাবে, ওভাবে, উঁহু সেইভাবে ...। শহরে পৌঁছে এসব ভাবা কথা হারিয়ে যাবে। থেকে যাবে কিছু শব্দবাক্য আকাদেমি চত্বরে।

গালুডি স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। সব চিন্তা, সব আহ্বান খান খান হয়ে গেল। দানবের মত ট্রেন ঢুকছে প্লাটফর্মে। যাব শহর, কলকাতা। তারই আহ্বান এখন।

প্রসঙ্গ ভ্রমন

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের একশো বছর আগে প্লুটার্ক বেশ কিছু ভ্রমনকারীর কথা লিখে গেছেন যাঁরা জীবনের বেশ কিছু সময় পান্থশালা এবং নৌকায় কাটিয়েছেন পৃথিবীর নানা অঞ্চল ভ্রমনের জন্য। প্লুটার্ক–এর লেখা থেকে জানা যায় যে এই সময়েও নানা জায়গা ভ্রমনকালে 'গাইড' থাকত। এই গাইডরা ভ্রমনে গিয়ে পর্যটকদের সাধারনত নানা প্রস্তরফলক ও সমাধিফলকের লেখার বিবরন দিতেই মশগুল থাকত।

গড় পাহাড় জলনূপুর আর আমি

ঋত্বিক ঠাকুর

বেলা ১২টা। জাতীয় মহাসড়ক-২ বেয়ে দীপক সালুজার ওয়াগন-আর গড়াচ্ছে। পাশের সীটে বসে কুয়াশায় মেলে রাখা আলোর ভিড়ে ডানা দেখছি। এখন পৌষের মাঝামাঝি। কলকাতা থেকে তা প্রায় পাঁচশ কিমি. দূরে এই পাহাড়তলিতে ঝুম দুপুরের গল্প গিলছি। দীপক স্থানীয় ছেলে, নিজের গাড়ি নিজেই চালায়। ঝাড়খন্ডিদের মতই ঝলমলে। ঠোঁটে আশ্চর্য হাসি মেলে অনর্গল কথা চালাচ্ছে — এ জায়কা কে কুছ নয়ী চেহ্‌রা সে আপকো পরিচয় করা দুঙ্গা। কথার ফাঁকে কখন যে রাস্তায় নেমেছি। বাঁ দিকে ইলেকট্রিক পোলের তার টপকে পাহাড়ের গায়ে চোখ রেখেছি। অদ্ভুত আলোর অহংকার নিয়ে এক অচেনা মহৎকে দেখছি। পাহাড়ের নিচে কুয়াশার হামাগুড়ি। সামনে সর্ষে মাঠ, রাস্তায় মাইল পাথরে লেখা - SH-2 /ভুরকুন্ডা। শীত লাগছে না। ঠোঁটে বেড়ে উঠছে শব্দখুশি — এখানে শীত আলোয় ভরপুর/কামড়টুকু উষ্ণ দাগে চুর।/বুনোপাখির উড়াল টানা জ্বরে/আনন্দ দেশ পুড়ছে আকুল স্বরে।

দীনেশ ভুঁইয়া। ডিঙিদার। হালকা হালে হাত রেখে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে ওই অচীন পাহাড়টার কাছে। কিশোর দীনেশ। চোখে অনন্ত রোদ্দুর। এই জলপুরের কাহিনি ওর হাতের তালুর মত জানা। বিরাট জলাধারে আমরা এখন নৌকাবিহারে। এ জলাধারকে স্থানীয় মানুষ বলে নালকারি ড্যাম। নালকারি আসলে এক বুনো নদী। সেই নদীতে বাঁধ টেনে এখানে থার্মাল পাওয়ার আর পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে ঝাড়খন্ড সরকার। এটা পতরাতু গ্রামের মধ্যে। এ ড্যাম পরিচিত। সকলেই জানে। যা জানে না তা বলি। নৌকোয় চেপে জলে ভেসে চলেছি। কালো দড়ির দাগটানা সামনে। হঠাৎ দেখছি সেই দড়ির দাগ মিলিয়ে গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ডানার উড়াল। পাখি। অনেক অনেক পাখি। দীনেশ মাঝি চেনে এদের। বলে উঠল — বিদেশী রাজহাঁস। দীপকও সমান তালে বলল — এখানে শীতকালে অনেক পাখি বেড়াতে আসে, সবচেয়ে বেশি দেখা যায় Bar-Headed Goose/White Necked Stork / Oriental White Ibis/Northern Shoveler. আমি তালকানা, পাখি চিনি না। তবে ওদের উড়ান নেশায় কেমন বুঁদ হয়ে যাই। আকাশে পাখির আলাপ শুনতে শুনতে কখন যে পৌঁছেছি পতরাতু দ্বীপে। জলের নিচে পাথর। পাথরে সবুজপানা। দীনেশ বলছে — অনেক গভীর জল। সে জলে শ্যাওলার সংসার। বুনো কলকে ফুলে দুলছে পৌষ মেলা, দূরে দূরে পাহাড়ের মাথায় নেমেছে ধোঁয়ার দামাল মেঘ। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ড্যামের গেট। চাদ্দিকে পাহাড়। মধ্যে নালকারি আর আমরা তিন ডিঙিযাত্রী। বেশ একটা স্বর্গঘোর অনুভব করছি। মনে মনে তারিফ করছি শ্যামলের। শ্যামল মিত্র। আমার রাঁচির বন্ধু। ওরই সৌজন্যে আমার এই সফর। রাঁচি থেকে বাইকে চাপিয়ে আমাকে আজই সকালে রামগড়ে নিয়ে এসেছে। পার্বতী হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত করেছে। জুড়ে দিয়েছে দীপকের চাকায়।

পাহাড়ে ঘেরা ইছাতু গ্রাম ছবি - লেখক

পাকে পাকে পেরিয়ে যাচ্ছি সেই ভূগোলখ্যাত জিলিপি ঘাঁটি। পতরাতু। রামগড় থেকে প্রায় ৩৫ কিমি.। জিলিপির মতন প্যাঁচানো। পাকদন্ডি। নিচে পেছনে। দেখছি। ছবি আঁকা নালকারি নদী। ছোটনাগপুরের সবুজ গালিচাপাতা বনস্থলী। বাঁকে বাঁকে জনপদ। তালাটাঁড়। রতনটাঁড়। হেসাল, সিমালডি, রোড়িয়া, রোড়িয়ার একজায়গায় দীপক ব্রেক কষল। দু'ধারে বন, লম্বা শাল। কেঁদ আর মহুয়ার ছায়া। সামনে গ্লো-সাইনে লেখা — পিঠোরিয়া (১৮ কিমি.) — কাঁকে (২৮ কিমি.) — রাঁচি (৩৮ কিমি.)। রাস্তার বাঁকে ছায়ার বেড়ায় দূরপাহাড়। নিচে। সেতুর নিচে রোড়িয়া নদী। আপন মনে বইছে। কেমন স্বপ্নের মতো।

হঠাৎ-ই স্বপ্নছুট। মাটিতে। বাস্তবে। রাস্তার ধার ঘেঁষে সাইকেল বোঝাই কয়লা নিয়ে হেঁটে হেঁটে চড়াই ভাঙছে গেঁয়ো মানুষ। দলে দলে। গাড়ি থেকে নেমে একজনকে দাঁড় করালাম। শিবু ওঁরাও, জানাল, রামগড়ের সেন্ট্রাল কোলিয়ারি নজরদারি এড়িয়ে ওরা রোজ রোজ এমনি করে খনির কয়লা তুলে রাঁচি যায় তিনগুণ দামে বেচতে। ওহ! ভাবা যায়? ৫০-৬০কিমি. আসা-যাওয়া, প্রতিদিন। পেট, জীবিকা, বেঁচে থাকা! তা-ও চুরি করে! আবার এগোচ্ছি। মন খারাপের গল্প এককোণে রেখে চোখ মেলেছি পাথরলিপিতে। পিঠোরিয়ার চৌমাথা ছেড়ে একটু বাঁয়ে কাঁচা সড়ক। সেই রাস্তায় গাড়ি গড়াচ্ছে। সামনে একটা মায়া পাহাড়। টানছে। দীপক থামল। পাথর পেতে একা একা বসে বংশী সাধু। বলল, যাইয়ে না, গুরু মুড়াঢ় কা থান, দ্বারসিনি দেবী দর্শন কিজিয়ে। যাওয়া। সুন্দরের যাত্রায় একটা চাতাল। দীপক পার্ক করল। আমরা এখন পাহাড়ের পায়ে। সামনে গেট। সিঁড়ি পাতা। টপকে চলেছি। আস্তে আস্তে সিঁড়ি উধাও। দু'ধারে জঙ্গল ঘন হয়ে আসছে। বিড়িপাতার মহল। একদল দেহাতি ছেলেমেয়ে নিচে নেমে আসছে। ওরা বলল, একদম ওপরে দ্বারসিনি। পাথর টপকে চললাম। কত যে রঙবাহারি বুনো ফুল পথ দেখাচ্ছে। একজায়গায় গুহা। পাথরে লেখা — মুন্ডা হর স্থল। এখানে এসেই বুঝি সংকল্প বাঁধা মস্তক মুন্ডন করে দেহাতি ঈশ্বরভক্ত মানুষ। গুহার মধ্যে দিয়ে চূড়ায় চড়লাম। বিরাট বেদিতে দ্বারসিনি। শিলাস্তূপ। চাদ্দিকে উজ্জ্বল সবুজ। যেন দেবভূমির নিসর্গ ময়দান। স্বপ্নজীবনের অখন্ডকবিতা আঁকা সুন্দর ভুবন। চোখে নেমে আসছে আশ্চর্য আবেশ। প্রায় দু'হাজার ফুট পাহাড় ভেঙে এই তো পাওয়া! কোনও শ্রম, কোনও ক্লান্তি নেই। ভেসে যাচ্ছি অসম্ভব উল্লাস ভেলায় খাঁচাছুট পরাণজীবী। দীপকের তাড়ায় তড়বড়িয়ে নামছি। নিচে। এখান থেকে আবার ফিরব সেই জিলিপি ঘাঁটিতে। সূর্যডুবি দেখতে। একটু পা চালিয়ে, ভাই। চলো, সূর্য ঘুম দেখবে না?

সূর্য ঘুমোতে যাচ্ছে। ওই দূরে পাহাড়পুরের অন্ধকারে। সেই অন্ধকারে আবির হাসিতে রঙমহলের সাজ সাজছে এই পতরাতুর প্রকৃতি। কে বলবে এখানে শীত? এ যেন চিরবসন্তের আকাশ ডাঙা, সবুজ। হলুদ, লাল। আর মাথায় নীল টোপর। অবন ঠাকুরের তুলি বুলোনো রঙবাড়ি যেন। কোথায় যে টেনে নিয়ে যায়! খিদে-তেষ্টা ভুলে মেরে পটাপট শাটার টিপছি। পূবে মাটিতে এলোমেলো বিছিয়ে নালকারির পানি আড্ডা। এমন ছবিটা কবিতার মতন পাতায় কে বাঁধাতে পারে! ধুস! আমার তো তিন ছন্দের গন্ডী। ছাঁদ ভাঙা এ বিশ্বকাব্য দেখতেই বারেবারে ছুটে আসতে হয়। সে এই পতরাতু-ই হোক আর পাতাবাড়ি। এক এক দেশে এক এক রকমের ধুম ঠাট। জয়-জয়ন্তীর জলসা। ঘোর ভাঙল দীপকের ডাকে। দাদা, আব ঘর চলে? ঘর? ঘর কোথায়? পথিকের ঘর যে তার পায়ে পায়ে ঘোরে।

বেলা ১১টা। দীপক পুজোয়। ছিন্নমস্তিকার মন্দিরে। আমি খালিপায়ে দামোদরের জলপাথর টপকে চলেছি। অন্য এক ঈশ্বরীর টানে। অনেক ওপর থেকে সাঁই করে নিচে নেমে ছোঁ। মাংসর টুকরো ঠোঁটে ওই উড়ে গেল ভৈরবীর ওপারে অশ্বত্থ গাছের মগডালে। আমার ক্যামেরায় জুম অন। দেখছি। তাক লেগে যাচ্ছে। চিল মা শাবকের ঠোঁটে গুঁজে দিচ্ছে মাংসখন্ড। আহা মাতৃত্ব! নিজেকে উপোসে রেখে সন্তানের প্রতিপালন। আমি তো বিস্ময়ে পাথর। রাজারাপ্পার ওই ভক্তদল জানতেই পারল না, ওদের বলিদানে ঈশ্বরী চিলের সংসার চলছে। চিল শুধু আকাশচারী শিকারী-ই নয়, সে-ও ভালোবাসার ধর্মসংসারী। কখন যে দামোদর আর ভৈরবীর মিলনজোড় পেরিয়ে চলে গেছি ওই অশ্বত্থ গাছের তলায়! আরও আরও কাছে থেকে ওই চিল মা-কে দেখব ব'লে। খেয়াল নেই। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে হঠাৎ দেখি দীপক ওর লাল মাফলার উড়িয়ে আমাকে খুঁজছে। ফিরে এলাম দীপকের গাড়িতে। ও বলল, দাদা, বঢ়ি খুশি সে আজ অমাবস্যা কী পূজা দী, মা-কো। আমি ভাবছি অন্য কথা। রাজারাপ্পার এই অনাসৃষ্টি ধর্মসাধের মধ্যে আমি যে পূর্ণিমার চাঁদের মতন উজ্জ্বল পবিত্র এক অন্য মা-কে আবিষ্কার করে বসেছি! থাক, তার কথা দীপকভাই নাই-বা জানল।

জাতীয় পথ-৩৩। রামগড় থেকে দশ কিমি. দক্ষিণে চুটুপালু ঘাঁটি। পাথরের বাঁকে মোড়া চুটুপালু। বাঁয়ে রামগড় ভ্যালি। বসে আছি একটা চা দোকানে। কনকনে ঠান্ডায় চা-এ চুমুক দিচ্ছি। হঠাৎ এক বুঢ়াবাপ আলাপ জমালো। নিজেই বলল এখান থেকে প্রায় দশ-বারো কিমি. পূবে এক সাধু পাহাড়ের গল্প। অতঃ চলা। চুটুপালু থানার সামনে বাঁয়ে মুড়েছে এক লালমাটির পথ। চললাম আমরা। প্রথম গ্রাম দোহাকাতু, বড় গঞ্জ। আরও এগিয়ে তিলাইয়া গ্রাম। এখান থেকেই সেই অনিন্দ্য ভ্রমণ শুরু। বাঁকে বাঁকে গভীর থেকে গভীর অরণ্য ভুবন। শাল-সেগুন-মহুয়াদের চিনি। এরা তার বাইরে। আমি জানিই না এসব গাছ-গাছালির নাম। দূরে ডানদিকে পাহাড় আর পাহাড়। বাঁয়ে মালভূমি। এ গ্রামের নাম ইচাতু (ICHATU)। মনে হচ্ছে, ইচ্ছাতুর। বারে বারে ইচ্ছা জাগবে এদেশের মাটিতে বাসা বাঁধতে। দীপক গাড়ি থামাল। সামনের ঢাল বেয়ে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে নেমে আসছে গ্রামের ললনারা। লজ্জায় রঙিন বিদ্যুৎ খেলছে। শরীরে বুনো পাহাড়ের নরম আলোর পসরা। ওদেরই একজন বলল, ওই সামনের চরাই ভাঙলেই পইলি বাবার পাহাড়। চললাম। কিছুটা চরাই ভেঙে একটা উৎরাই। সেতু। নিচে ইচাতু নদী। তার পাশ দিয়ে পাহাড়ের রাস্তা। গাড়ি যায় না। আমি দীপককে রেখে হাঁটছি। গভীর

অরণ্যছায়া। সামনে এলো একজন। লক্ষ্মণ পোহান। হাত ধরল আমার। মনেই হোল না আমি ওর গাঁয়ে আগন্তুক। উঁচু উঁচু পাথর টপকাচ্ছি। দুর্গম। বিপদফাঁদ পাতা। চড়ছি। ভয় নয়, অজানার পরখ নিতে চললাম অভিযাত্রীর সাহসে। চূড়ায়। চড়েছি। সামনে পাহাড়ের দেয়াল লেখা — ডেলি পইলি বাবা কা থান। সামনে গুহা। ভেতরের অন্ধকার থেকে কোত্থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। লক্ষ্মণ জানালো, এ আলো কালীমা-র, এই গুহায় রোজ সূর্যাস্তের পরে ধুনিসাধনায় বসেন পইলি বাবা। আবার ভোরের আগেই কোথায় যে মিলিয়ে যান! আশ্চর্য। আমি চাদ্দিকে দেখছি। পাহাড় দিয়ে ঘেরা সুন্দর মহল। কিছুক্ষণ বসলাম। হঠাৎ দেখি একটা ঝোপের আড়ালে অনেকটা ফিঙের মতন দেখতে এক অচীন পাখি। কিছু খুঁজছে। ঠুকরে ঠুকরে। পাথরের ফাঁকে কী এমন অমূল্য বস্তু আছে! ওই পাখিই জানে। লক্ষ্মণের হাতে হাত রেখে পাহাড়ের নিচে নেমে এলাম। সামনে এসে দাঁড়াল এক ছিন্নবস্ত্র বেহেড মাতাল। লক্ষ্মণ বলল, ওর নাম পূজন। পইলি বাবার চ্যালা। ওই জানে ডেলি পইলি বাবার সাধন রহস্য। পূজন হাত পাতল। আমি একটা দশ টাকার নতুন মুদ্রা ওর তালুতে গুঁজে দিয়ে বললাম, অর থোরা দারু পী লেনা। একগাল হাসিতে পূজন তখন সাক্ষাৎ ভগবান।

দুর্গম বরসো পানি ঝরণা ছবি - লেখক

বেলা এখন অনেক। পশ্চিমে যাচ্ছি। হাজারিবাগের দিকে। সেই এন.এইচ.-৩৩ ধরে। রামগড়। হুহুয়া, কুজু, মান্ডু শেষে চড়ি (CHARHI)। প্রায় ৩০ কিমি.। বেলা গড়াচ্ছে। দীপক কিছুটা হতোদ্যম। যাকে খুঁজছি তাকে কেউ যে চেনে না! চড়ি ফ্লাইওভারে, নিচে নেমে একটা পেট্রোল পাম্প। একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। বললেন, এ গ্রামের নাম সরবাহা। চুর্চু বঙ্ক। এই পাম্পের পাশ দিয়ে অনেক ভেতরে দু'তিনটে গঞ্জ পেরোলে সেই গন্তব্য। যায় অনেকে। তবে বেলা পড়ে আসছে। রাস্তাও যথেষ্ট দুর্গম। শীতকাল। সাবধানে যাবেন। এসব শুনে দীপক মুহ্যমান। নতুন গাড়ি। ফেঁসে গেলে? আমি অভয় মন্ত্র দিয়ে দীপককে ছোটাচ্ছি। নাচ শুরু। উদয়শঙ্করের। এবড়ো খেবড়ো পাথরভাঙা পথ। সামনে একটা বোর্ডে লেখা — গুরুতরী। গুরুতর ভ্রমণ আমাদের। বাঁদিকে গ্রাম। একটা বালিকা দাঁড়িয়ে। জানালো, অনেক দূরের জঙ্গলে সেই নূপুর সুন্দরীর থান। চলেছি। হঠাৎ সামনে গড়ান। নিচে এক মরা সোঁতা। সামনে একটা স্টোনক্রাশার চলে গেছে। ওই সোঁতা পেরিয়ে। দীপক গাড়ি নামাল সেই সোঁতায়। ফার্স্ট গিয়ার। তারপর গোঁ গোঁ করে চরাই পেরিয়ে এক পাহাড় মাথায় আমরা। আলো কমে আসছে। একটা জাপানি কলে মুখ ধুচ্ছে একজন কিশোর। ডাকলাম। বললাম ওই বুনো ঝোরার কথা। এ ছেলের নাম রাহুল। রেললাইনের ঠিকা মজুর। কোডারমা থেকে রাঁচি পর্যন্ত রেলের কাজ প্রায় শেষ। রাহুল চলেছে সামনে। গাড়ি আর গড়ালো না। পায়ে পায়ে পাহাড়ের নিচে নামছি এ গ্রামের নাম দলদলিয়া। দারুণ ঠান্ডা হাওয়া বইছে। দীপকও কাঁপছে। বুনো মাঠ পেরিয়ে ঢুকে যাচ্ছি গভীর জঙ্গলে। পাথর। পাথর। ছলছলাৎ নদীর আলাপ স্পষ্ট হচ্ছে। রাহুল জানাচ্ছে, মাত্র তিনদিন আগে সে এই ঝোরার খবর পেয়েছে। অথচ রাহুল এই গ্রামে ঠিকে কাজে প্রায় ছ'মাস রয়েছে। কী কপাল আমাদের! রাহুল না থাকলে এই আজব নদীর কাছে দাঁড়াতেই পারতাম না। সূর্য ডুবল। বেলা পাঁচটা। ঝিঁকঝোর বা ঝাঁকঝোর নেমে আসছে একটা গুহাপাহাড় থেকে, নির্জনতার দরবারে ইমন ধারার জলসা শুনছি। রাহুল বলছে, আরও সামনে গেলে হাততালিতে বৃষ্টি ছড়ায় এ ঝর্ণা। তাই তো একে বলে — বরসো পানি। না, সামনে গেলাম না। অন্ধকারের আলোয় নিঃসঙ্গ ঝিঁকঝোরের আলাপ মাখছি অন্তর জুড়িয়ে। মনে হচ্ছে, সূর্য সত্যি সত্যিই ডোবে না, ডুববে না। সুন্দর যে অফুরান আলোর সূর্য জ্বালিয়ে অপেক্ষা করে আলাদীন আনন্দের জন্য। আর আনন্দ? সে-ও যে তামস পেরোনো পথের বাঁকে পেতে রেখেছে অরূপ আবাস। এত যে ছোটা, সে তো এই ছুটিরই সঙ্গ পেতে।

প্রয়োজনীয় তথ্য ঃ (১) এসব গন্তব্যের আদর্শ সময় শীত-বসন্ত। (২) শক্তপোক্ত গাড়ি ও স্থানীয় গাইড সঙ্গে নিয়ে এসব অপরিচিত গন্তব্যে যাওয়া উচিৎ। (৩) রামগড়ে থাকার জন্য বিভিন্ন মানের হোটেল আছে। চড়ি ও চুর্চুতেও অনেক বাজেটে হোটেল পাওয়া যায়। (৩) রামগড়ে বিভিন্ন রকমের ভাড়া গাড়ি পাওয়া যায়।

পাহাড়ে প্রথম পা

দিবাকর দাস

আমার হিমালয় ভ্রমণ তুখোড় পর্বতারোহীদের সাথে কোনভাবেই মেলে না। কিশোর বয়সে আমার কাছে হিমালয় মানে হরিদ্বার থেকে দেখতে পাওয়া শৃঙ্গরাজি। খুব ছোটবেলায় (১৯৭৬-৭৭) বাবা-মায়ের হাত ধরে সিমলা বেড়াতে গেছিলাম। আমার জন্মের বেশ কিছু বছর আগে সেখানে চাকরি সূত্রে ছিলেন আমার বাবা। সে যাত্রায় জুটেছিল অনেক স্থানীয় আম-আদমীর ঘরে আতিথ্যের সাহচর্য। সেই শহুরে পাহাড়ি সরু চড়াই উৎরাই পথে টাল সামলাতে সামলাতে চলার অভিজ্ঞতা এর বিশ বছর পরের ভ্রমণে কিন্তু পাইনি। শুধু রেল স্টেশন থেকে কালিবাড়ির চড়াইটা একইরকম কষ্টকর ছিল। এরপর দীর্ঘ ছেদ। ইতি উতি শুনতে পেতাম অমুকের শৃঙ্গ জয়, তমুকের শৃঙ্গজয়ী ক্লাবের কথা। সত্যি বলছি কোনদিন আগ্রহ হয়নি তলিয়ে জানার। একদিন হঠাৎ দেখি আমার পাড়ারই এক দাদা পিঠে বিরাট এক রুকস্যাক চাপিয়ে নিয়ে চলেছে। কী তার চলন। পিঠের ভারে সামান্য নত। হাতে একটা গাঁইতি মত কিছু (পরে জেনেছি ওটাকে আইস অ্যাক্স বলে)। পায়ে হান্টার সু। পরনে ট্রাকস্যুট। একজন বলল, ট্রেকিং-এ যাচ্ছে। আমার মনে সেই ছাপটা আজও কেটে বসে আছে। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল ট্রেকিং ব্যাপারটা কী। খুব একটা আগ্রহ হল না। কারণ হাঁটাহাঁটি কোনকালেই আমার আগ্রহের বিষয় নয়।

এভাবেই বেশ চলছিল। ২০০০ সাল নাগাদ আমার এক সদ্য হওয়া সহকর্মী পরে অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিরন্তর প্ররোচনায় পা দিয়ে ঠিক করি পিন্ডারী ট্রেকে যাব। সে বন্ধু চাকরিতে ঢোকার আগে বিভিন্ন এক্সপিডিশনে অংশ নিয়ে কয়েকটা উঁচু উঁচু শৃঙ্গ আরোহণ করেছে। ব্যাপারটাতে বাড়ির সকলেরই অল্পবিস্তর অমত ছিল। ফলে একদিন পুরো টিম বাড়িতে চড়াও হল। কথায় কথায় বলা হল, আমরা কোথায় যাব, কী করতে যাব ইত্যাদি। খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। বাবা সব শুনে বললেন, যেতে চাইছ যাও। মনে রেখো হিমালয় কিন্তু একটা নেশা। সব নেশার মত এরও কিছু অপকারী দিক রয়েছে। তবে এতে শরীরটা সুস্থ থাকে। কী থাকে আর কী থাকে না, সে সব কথায় আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমাদের দরকার ছিল কয়েকটি শব্দ। "যেতে চাইছ যাও।" কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্ধুদের বাড়িতে আসার কারণ শেষ। যে যার মত ঘরমুখো ছুট। এবার চিন্তা বাড়ল আমার স্ত্রীর। তার শঙ্কা অনাগত বিপদের। আর আমার চিন্তা হাঁটা। দলনেতা বলেছে হাঁটতে হবে। প্র্যাক্টিস করতে হবে। হাটে-মাঠে কিছুদিন জোরে জোরে (সাধ্যমত) হাঁটাহাঁটি করেও মনে খুব একটা বল পেলাম না। তবে বাকিরা সাহস যোগাল, ঠিক হয়ে যাবে। চল, চল....

রওনা হওয়ার কথা শনিবার। সেপ্টেম্বর মাস। অফিস করে রাতে ট্রেন ধরব। বন্ধু, যার মূল ভরসায় আমাদের এই যাত্রা সে অফিসে এল গলায় মাফলার জড়িয়ে। কী ব্যাপার? গলায় খুব ব্যথা। গায়ে জ্বর। ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু সব দেখে শুনে তিনদিনের অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন। কথাবলা বন্ধ। রেস্ট দরকার। এবার আসল কারণটা পাড়লাম। আমাদের যে আজই ট্রেকে বেরোতে হবে। শোনামাত্র জোর ধমক। ইয়ার্কি পেয়েছ? এই মারাত্মক ইনফেক্সন নিয়ে কেউ বেরোয়? তিনি পূর্বপরিচিত। মফস্বলের মানুষ আমরা। ফলে স্বাধিকার বোধেই তিনি পিতৃতুল্য শাসনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়াই শ্রেয় মনে করে, আমরাও আসছি, কাল এসে রিপোর্ট দিয়ে যাব; বলে বিদায় নিলাম। বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি। রাজেশ কিন্তু প্রথম থেকেই বলছে, কিচ্ছু হবে না। চলো তো ...

কারো বাড়ির লোকই জানল না একটা একশ তিন ডিগ্রি জ্বর গায়ের লিডার নিয়ে আমরা রওনা দিচ্ছি পাহাড়ের পথে। যে পথে চলার অভিজ্ঞতা ও ছাড়া আমাদের কারোরই নেই। ওর কথা জানল শুধু ওর বাড়ির লোক। ওর দুমাসের পুরোনো স্ত্রীর কান্না ঘরের দরজা ভেদ করে আমাদের কানে বাজছিল ডিজে-র ভল্যুমে। আমরা তখন বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছি ওর জন্য। মাসীমা কিন্তু শান্ত স্বাভাবিক। হাসিমুখ। খুব অপরাধী লাগছিল নিজেদের। শেষ পর্যন্ত আমরা পাঁচ বন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে অমৃতসর মেলে চাপলাম রাত বারোটায়। পরদিন দুপুর তিনটেয় লক্ষ্ণৌ। সারা ট্রেন জ্বর আর কাশিতে ছট্‌ফট্ করেছে ছেলেটা। এখান থেকে রাত ন'টায় মিটার গেজ ট্রেনে লালকুঁয়া। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঢোকার মুখেই একবার ওর মাথা ঘুরে গেল। কোনপ্রকারে ধরে ফেলাতে এ যাত্রায় বড় বিপদের থেকে রক্ষা হল।

পাঠক ভাবতেই পারেন, হিমালয় ভ্রমণের সাথে কার জ্বর কত? এর কী সম্পর্ক? আমার বিশ্বাসে ট্রেকিং নামক ভ্রমণ তো শুধু হাঁটা দিয়ে হয় না। তার সাথে জুড়ে থাকে তিনমাস-ছয়মাস-এমনকি এক বছরের প্রস্তুতি, ভাবনা, টানাপোড়েন। সব বাধা টপকে তবে তো — চল্ মুরারী হিরো বনকে।

আমাদের ইচ্ছা ছিল, ভাড়া গাড়িতে বাগেশ্বর-ভারারী হয়ে সোয়াং পৌঁছাব। সেখান থেকে তিনি কিমি. হেঁটে আপার লোহার ক্ষেত। সে সময় লোয়ার লোহার ক্ষেত অবধি গাড়ি রাস্তা থাকলেও গাড়ি সোয়াং অবধিই যাচ্ছিল। কিন্তু সোয়াং পৌঁছে পোর্টারদের সাথে দরাদরি ও রাজেশের জ্বর দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেখানেই রাত্রিবাসের। বিখ্যাত গাইড জাতোলি গ্রামের রূপসিংজী রাজেশের পূর্বপরিচিত। তাকে চিঠিতে আমাদের আগমন সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে উপস্থিত পোর্টাররা সবাই নাকি রূপসিংজীরই লোক। একজন শুধু বললে, সে রূপসিংজীকে চেনে কিন্তু তার লোক নয়। ওর কথাবার্তা বলার ধরণ আমাদের পছন্দ নয়। এই লোকটির আত্মমর্যাদা বোধ আছে। আমাদের ওকেই নেওয়া উচিত। তরুণের সেই যুক্তি যে সঠিক ছিল পরে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ট্রেকের কষ্টকর অধ্যায়ের শুরু সোয়াঙের হোটেল নামক স্থানে ভয়ঙ্কর গন্ধযুক্ত ঘর ও লেপের সাথে রাত কাটিয়ে।

সকালে রাজেশের জ্বর অনেকটাই কম। ঠিক হল আজ লোহার ক্ষেত্রেই রাত্রিবাস। ফলে মাত্র তিন-চার কিমি হাঁটা। স্যাক কাঁধে সেটাই আমার জীবনের প্রথম পথ চলা। পথ কোথায়! পাকা রাস্তা থেকে সোজা একটা গ্রাম্য পথ উঠে গেছে উপরের দিকে। বৃষ্টির জল মাটি ধুয়ে শুধু পাথরের দাঁত নখ বের করে রেখেছে। সে আবার কিছুটা এগিয়েই বাঁক খেয়ে অদৃশ্য। যথাসাধ্য স্বাভাবিকতা বজায় রেখে আমার হাঁটা শুরু। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই মনে হল, মা-স্ত্রীর কথা শুনে না আসলেই ভাল হত। যাক্ যা ভুল হবার হয়ে গেছে ... এখন হাঁটি। অনেক কষ্টে লোহারক্ষেত বাংলোটা এল। ভারি সুন্দর জায়গা। এবারে মনটা ভাল। দুপুরে ওখানেই ঘোরাঘুরি। আমরা ঢুকতেই চৌকিদার বাবু বললে, - 'আপলোগ রহিয়ে। হাম থোড়া বাজারসে আতে হে।' বাজার কোথায় রে বাবা! সে নিচে সোয়াং যাবে। ও মা ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরেও এল। আমার কাছে সে তো অতিমানব। বিকেলে বাংলোর লনে বসে তার কাছে গল্প শুনছিলাম। কথায় কথায় বললেন, ''আপলোক ঢাকুরি পাস যাতে ওয়াক্ত দেবীমা কা মন্দির মে পূজা দেকর যাইয়ে গা।'' মন্দির কোথায়? তার আঙুল নির্দেশ করল উপরে মেঘেরে দিকে। 'ও যাঁহা পর বাদল পাকাড় রাখা হ্যায়।' - 'উপার'? - 'কাল তো উসসে অওর উপর আপকো যানা হ্যায়।'

এবার কিন্তু আমার মনের অবস্থা সত্যিই খারাপ। মুড়িতে জলের ছিটে পড়লে যেমন হয়, তেমন আর কি! আকাশে তারা জ্বলল। পাহাড়ি জল গলায় পড়ে রাজেশের বুলি ও চাল খুলল কিন্তু নিজের অপরিনামদর্শিতায় বন্ধ হল আমার বুলি। পরদিন ভোর হতেই আমরা রাস্তায়। সে বিবরণে শুধু আমার প্রতি দলনেতার সাহস সঞ্চার করানো শব্দমালা। আর বহুবার বহুপাঠিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত। সে গল্প গুগুল মামার জন্য রেখে আমি শুধু পথের অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিই।

ঢাকুরির সৌন্দর্যের কথা অনেক শুনেছি। পথে চলতে চলতে বুঝেছি কাকে বলে ঢাকুরি কা চড়াই জর্মান কি লড়াই। তরুণের কাছে জানলাম চড়াই-এর সুপারলেটিভ 'চাঁড়'। এমন অনেক চাঁড় ভেঙে দুপুর বারোটার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ঢাকুরি টপ। পথে গতকালের দেখা মেঘেদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। ফলে ঠিক কতটা উঠেছি সে আন্দাজে অসুবিধা হচ্ছিল। পাসে পুজো দোওয়াই রীতি। পকেটের চকোলেট বিস্কুটই প্রসাদ। এখানকার ঠাকুরদের অত ছোয়া-বাসি ইত্যাদির বিচার নেই। পাস থেকে হাজার খানেক ফুট নামলেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ওটাই ঢাকুরি। প্রথম দর্শনে মাঠ বা বুগিয়ালটাকে বেশ ভাল লাগল। কিন্তু আমার শোনা গল্পের সাথে মিল নেই। মনটা দমে গেল। কোন পিকই দেখা যাচ্ছে না। হালকা লাঞ্চ করে বসে আছি জি এম ভি এন বাংলোর লনে এমন সময় সামনের চীরগাছেদের পিছনে লেগে থাকা মেঘটা হঠাৎই হালকা হতে শুরু করল। আর চোখের সামনে খুলে গেল দিগন্ত বিস্তৃত শৃঙ্গরাজি। মাইকতোলি, নন্দাকোট ইত্যাদি। নামে কী আসে যায়, সে স্বর্গীয় দৃশ্যের সামনে জীবনে প্রথমবার। বিলু কাকা পাশ থেকে বলল, ''ভাইপো, আসার সময় বেশি কষ্ট হয়েছিল?'' সত্যি বলছি, মনে করতে পারলাম না। এভাবেই রঙে রঙে নেমে এল অন্ধকার। এত বছর পরও স্থির বিশ্বাস মানালি, ডালহৌসি ও খাজিয়ারের মিলিত সৌন্দর্য ঢাকুরি। ঠান্ডা বাড়তে ঘরে ঢুকলাম। পোর্টাররা জানাল, কেয়ারটেকারের খুব বুখার। বেহুঁশ অবস্থা। তরুণের ডাক্তারিতেই পরের দিনই সে চাঙ্গা। আমরা আবার পথে। গন্তব্য খাতি গ্রাম।

পিকচার পোষ্টকার্ডের মত সুন্দর গ্রামে আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলল একটি গৃহস্থ বাড়ির দোতলায়। পাহাড়ি বাড়ি। নিচের ঘরের লেভেলে রাস্তা। উপরের ঘরের লেভেলেও অন্যদিকের রাস্তা। নিচের ঘরে ভেড়-বখরিদের আস্থানা। দোতলার মেঝে কাঠ ও বাঁশের উপর চাটাই বিছানো। দেওয়াল পাথরের উপর পাথর সাজানো। তাতে মাটির গাঁথনি। ছাদ স্লেট জাতীয় পাথরের। একতলার বাসিন্দাদের উপস্থিতি আমরা দোতলা থেকে গন্ধে টের পাচ্ছি। রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। মাঝরাতে শিবু বাথরুম যাবে বলে সবে দরজাটা খুলেছে। দাড়াম করে বন্ধ করে দিল। ''ভাল্লুক''। সেই আওয়াজে আমরা সবাই স্লিপিং ব্যাগের বাইরে। কী ব্যাপার? ভাল করে ঠাওর করে দেখা গেল, তিনি আসলে এক বিশাল পাহাড়ি কুকুর। এর পরের দিনগুলোতে সে-ই আমাদের সদাজাগ্রত বন্ধু। বিনিময়ে পেয়েছে কিছু বাড়তি খাবার।

খাতি থেকে বেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেছিলাম দোয়েলি হয়ে ফুরকিয়া। পরদিন রাত থাকতেই বেরিয়ে পিন্ডারি জিরো পয়েন্টে

সূর্যোদয় দেখে রাত্রিবাস দোয়েলিতে। পরদিন গন্তব্য দোয়েলি থেকে ঢাকুরি। বাংলো থেকে রেডি হয়ে বেরিয়ে পথে প্রথম পা-টা ফেলতেই বাম হাঁটুতে খচ্ করে লাগল। ও কিছু না। খানিকটা এগোতেই অস্বস্তিটা অসহ্য হয়ে উঠল। প্রথমে স্প্রে, খানিকটা চলা, নি-ক্যাপ আবার চলা, ক্রেপ ব্যান্ডেজ-পেন কিলার কোন কিছুতেই ব্যথা এল না বশে। একটা করে পা ফেলছি আর চোখে জল চলে আসছে। একমাত্র চড়াইতে কোন সমস্যা নেই। আর এতো প্রায় পুরোটাই উৎরাই পথ। গতি যথারীতি স্লথ। পথে দেখা কয়েকজন পি. ডব্লু. ডি.-র লোকের সাথে। ওনারা ঢাকুরি ফিরছেন। তাদের গতি আমাদের থেকে অনেক বেশি। ওদের মুখেই খবর পাঠানো হল ঢাকুরিতে বাংলোর কেয়ার টেকারকে। আমাদের জন্য যেন একটা ঘর বুক করে রাখে।

ঢাকুরি বুগিয়াল আমাদের দৃশ্যগোচর হওয়ামাত্র অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল। মাঠ লোকে লোকারণ্য। আমাদের কাছে টেন্টও নেই। যাই হোক গন্তব্যে পৌঁছে দেখা গেল আমাদের জন্য ঘর রাখাই আছে। যাক্। পাশের ঘরেই জনাচারেক সুবেশা ভিন্ন ভাষাভাষী তরুণী। ফ্রেস হয়ে বসতেই জনা চারেক যুবক এলেন আলাপ করতে। তারা সবাই আই.এ.এস.-এর ট্রেনিং সমাপ্ত করা অফিসার। এখান থেকে ফিরে সবাই পোস্টিং পাওয়া জায়গায় চলে যাবে। এই ট্রেকিং তাদের ট্রেনিং-এর অংশ। আমাদের প্রতি তাদের আগ্রহের কারণ, ওরা বুঝে নিতে চাইছে আমরা ওদের থেকে ঠিক কত বড় হনু। ওদের না দিয়ে সব থেকে ভাল ঘরটা কেয়ার টেকার আমাদের দিয়েছে। ওরা কী করে জানবে গতদিনের চিকিৎসার গুণ। আমরাও ভাঙলাম না গুহ্য কথা। আমাদের আপ্যায়িত করে নিয়ে চলল তাদের দলের সাথে আলাপ করাতে। আমি তো পায়ের ব্যথায় কাতর। ফলে মুখে সপ্রতিভতার বদলে গোমড়া ভাবই ফুটছে বেশি। ওদের দলের একাংশের ইচ্ছা ট্রেক বাতিল করে সমতলের আরামে ফেরা। এমন পরিবেশে বিলু কাকা সেই অনিচ্ছুক দলের সামনে আমাকে পেশ করল এক মহান পর্বতারোহী হিসাবে। মাইকতোলিতে চেপে পড়া আমার কাছে যেন কোন ব্যাপারই নয়। ওর বাঙালি গুলের তোড়ে হবু আই.এ.এস. অফিসারদের মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। আমার আবস্থা আরো খারাপ। মিথ্যে ধরা পড়লে মার একটাও মাটিতে পড়বে না। এদের সাথে আবার আই টি বি পি-র জওয়ানরা রয়েছে। বেয়াক্কেলে হাসিটাও পেটের ভিতর থেকে দম্‌কে দম্‌কে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যাই হোক, বৈকালিক কফি-পকোড়া সহযোগে সমস্ত ঘুষ ও প্রলোভনকে সামাল দিতে আমায় ছদ্ম সততা ও উদাসীনতার মোড়কে মুড়ে থাকতেই হল। সবার একান্ত অনুরোধ, একটিবার ওদের লিডার সাবকে বলা যে এই রাস্তায় এরা যেতে পারবে না। আর আমার মত বড় মানুষের কথা তিনি একেবারে ফেলে দিতে পারবেন না। কোনক্রমে তাদের হাত থেকে নিস্তার পেতেই মনটা বিষণ্ণ। এদের হাতেই থাকবে ভারতের ভবিষ্যৎ।

পরদিন ভোর হতেই আমরা আবার পথে। আবার সেই লেংচে লেংচে চলা। বারো কিলোমিটার। এভাবে দুদিনে হেঁটেছি একুশ কিলোমিটার। সমতলে এই অবস্থায় একুশ পা-ও হাঁটতে পারতাম না। আমার প্রথম হিমালয় ভ্রমণ আমাকে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিল। এখানে না হাঁটলে জানতেও পারতাম না কী অমূল্য রতন লুকিয়ে আছে প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামের অন্দরে। এখানে ডাক্তারখানায় যেতে কুড়ি কিমি. হাঁটতে হয়। অধিকাংশ সময় রোগীর বিবরণ ডাক্তারের কানে পৌঁছায় অন্য লোক মারফত। ওষুধ পৌঁছাতে দুদিন। চাল ডাল আলু গোবির পাশাপাশি দাওয়াইও বিক্রি হয়। পাহাড়ে পঁচিশ কিমি. দূরের গ্রামের মানুষের খবর নিরন্তর একে অপরের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই চেনে সবাইকে।

জানতাম কী ছাই, আমিই বা কতটা কষ্ট সহ্য করতে পারি। কাকেই বা বলে ঠেলার নাম বাবাজী।

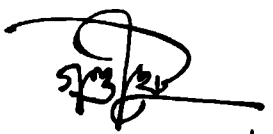

প্রসঙ্গ ভ্রমন

মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছেড়ে ভারতে আর্যরা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে এসে পৌঁছান। সেই অর্থে আর্যরাই প্রথম ভারতীয় পর্যটক। আর বৈদিক সাহিত্য পৃথিবীর প্রথম ভ্রমনকাহিনী।

ইমলি-তুতানের ডাইরী

প্রবীর কুমার বিশ্বাস

ঘটনাটা ঘটলো সপ্তাহ খানেক আগে। চিলেকোঠার ঘরের পুরোন বই-খাতার স্তূপ সরিয়ে সেটাকে ব্যবহারযোগ্য করতেই হাত লাগিয়েছিলাম। একটা হলুদ পলিপ্যাক উঁকি মারছে দেখে টেনে বার করলাম। তার থেকে উদ্ধার হলো হারিয়ে যাওয়া দুটো ডাইরী। ব্যস, ঘর গোছানো মাথায়, একলাফে পিছিয়ে গেলাম আঠারোটা বছর। একটা ঈশানী সেন মানে ইমলির আর অন্যটা তুতান অর্থাৎ তুষার মিত্রর লেখা ডাইরী। প্রথম পাতাতেই বড় বড় করে লেখা, 'পাখি পাহাড় ক্যাম্প', ডিসেম্বর ১৯৯৮।

আরো দু'বছর পিছিয়ে যাই। তখন আবাসনের পিছনের পুকুর পাড়ে ছোটো ছোটো বন্ধুদের নিয়ে নিয়মিত পাখি চেনাই। কখনও টেন্ট বানিয়ে সারাদিনের জন্য 'ডে আউট ক্যাম্প' করি। দড়ি-দড়া দিয়ে মই বানিয়ে গাছে চড়া শেখাই। সে এক দারুণ 'সব পেয়েছির দেশ' গড়ে তুলেছিলাম। শীত পড়তে না পড়তেই দল বেঁধে চলে যেতাম পুরুলিয়ার পাহাড়ে অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে, 'প্রকৃতি পাঠের' আসরে। একদিন মায়ের সাথে ইমলি আর দাদুর হাত ধরে তুতান হাজির হলো সেই পুকুর পাড়ে। কত আর বয়স? তুতান দশ হয় নি, তবে ইমলি বারো।

— "বড় হয়ে কি হতে চাও?"

তুতানের উত্তর, "রবিনসন ক্রুশো"। চোখ বড় বড় করে তাকালাম ওর দিকে। ইমলি জানালো — আন্টার্কটিকা যেতে চায় ও। ইমলির ছবি আঁকবার হাতটাও চমৎকার। ক্যাম্পের বন্ধু হতে আর কি চাই?

তারপর ফিরে আসি ১৯৯৮ সালে পুরুলিয়ার পাখি পাহাড়ের অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পের গল্পে। ইচ্ছা করেই সে বার লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে ঠাকুরবেড়ার গভীর জঙ্গলের মাঝে ফেলেছি আমাদের ক্যাম্প। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সরু এক জলের ধারা। জঙ্গল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা দামাল ক্যাম্পার। আগুন জ্বালিয়ে রান্না, Track Signs চিনে পৌঁছে যাচ্ছে পাখি পাহাড়ের মাথায় বা পাপরো ড্যামের ধারে। সেই সাথে রক ক্লাইম্বিংও চলেছে চুটিয়ে। কখনও পাখি, পোকা অথবা ভেষজ গাছ-গাছড়া চিনছে কখনও মালভূমির ভূগোল অথবা স্থানীয় মানুষের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হচ্ছে। ওদের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে আমি বা আমার মতন প্রশিক্ষকরাও বেদম হয়ে পড়ি। প্রথম দুদিন দারুণ কাটলো। সেবার জংলী হাতির উৎপাতটাও ছিলো না। গোল বাধলো পরদিন দুপুরের পর থেকে। দলবল নিয়ে আমরা পাখি পাহাড়ের উত্তরের ঢাল ধরে আম ঝর্ণা যাচ্ছি। ধস্‌কা গ্রামের বাইরের মাঠে বসে সুমিতাদি আকাশে জমতে থাকা কিউমুলাস মেঘ চেনাচ্ছিল। আমি আবার একটু বেশি সাহসী হয়েই প্রকৃতির বিপদ সংকেত অগ্রাহ্য করেই রওনা হলাম আম ঝর্ণার দিকে।

আম ঝর্ণার পরিবেশের ছবি ভাষায় বর্ণনা করা আমার অসাধ্য কাজ। বাচ্চা-বুড়ো সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো এখানে এসে। অন্ধকার করে সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়লো। দৌড়-দৌড়! প্লাস্টিক সীট দিয়ে বৃষ্টি আটকালাম কোনও মতে। বড় বড় পা ফেলে ঠাকুরবেড়া ক্যাম্পে ফিরে রোল কল করতেই বুঝতে পারলাম দুজন কম। তুতান আর ইমলি ভ্যানিস। পিঠের মেরুদন্ড বরাবর বয়ে গেল ঠান্ডা রক্তের স্রোত। ঠান্ডা মাথায় সার্চ পার্টি তৈরী করে বড় টর্চ আর গ্রামবাসীদের সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকার পাহাড়ে। অন্য ক্যাম্পাররাও মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে আমাদের কর্মকান্ড। অন্ধকার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বসে আছি, কোথাও যদি টর্চের আলো বা আগুন দেখা যায়, ওরা পুরোনো ক্যাম্পার, সাথে সব সময় survival kit থাকে, তবুও ওদের কম বয়স ও অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করলেই ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। ঝড় উঠতেই আম ঝর্ণা থেকে ফিরবার আগেই দেখে নেওয়া উচিত ছিলো, সবাই উপস্থিত কিনা। মনে মনে ভাবছি, এরপর কি কি কাজ করতে হবে। সকাল হলেই যেতে হবে পুলিশে, খবর পৌঁছতে হবে ওদের বাড়িতে। ওদের দুজনের না জানি কত কষ্ট হচ্ছে একা একা জঙ্গলে। ওদের কথা মনে করে আমরা কেউ রাতের খাবার মুখে তুলতে পারলাম না। মনে মনে প্রার্থনা করছি, ওরা যেন আমাদের না পেয়ে অন্ধকারে নিজের থেকেই রাস্তা খুঁজে ক্যাম্পে ফিরে আসবার চেষ্টা না করে।

খবর পেলাম, আম ঝর্ণায় ওরা নেই। চক দিয়ে Track Sign আঁকা আছে, যার অর্থ — 'তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে Camp-য়ে ফিরে যাচ্ছি'।

"সর্বনাশ!" নিজের মনেই বলে উঠলাম। কারণ ওই অজানা গোলোক ধাঁধা থেকে নিজে নিজে রাস্তা খুঁজবার চেষ্টা করলে আরো বড় গোলোক ধাঁধায় পড়বে। এতো বড় ভুলটা ওরা কীভাবে করলো? মনে মনে বলতে থাকলাম, 'এতদিন তোরা যা শিখেছিস — সেই কাজগুলো করে দেখা, আমি জানি তোরা পারবি।'

দুঃশ্চিন্তা আর দুঃস্বপ্নের রাত গিয়ে আকাশ ফর্সা হলো। মানসিক ও শারীরিক ভাবে আমরা সবাই ক্লান্ত। হঠাৎ করেই দেখি সার্চ পার্টির সাথে সাথে সবার আগে আগে গট্ গট্ করে ক্যাম্পে ঢুকছে ইমলি আর তুতান। বাকী ক্যাম্পাররা হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। ক্লান্তি, ভয় কিছুই পেলাম না ওদের চোখে

মুখে। ক্যাম্পে বয়ে যায় খুশির হাওয়া, সেদিনকার ক্যাম্প ফায়ারে ওরা সবাইকে শোনালো অ্যাডভেঞ্চারে ভরা রাত কাটানোর গল্প। আমি তুতানের হাতে দিলাম আমার প্রিয় 'সুইস নাইফ'টা আর ইমলির মাথায় পরিয়ে দিলাম আমার 'হেড টর্চ' উপহার হিসাবে। আর ওরা আমাকে অবাক করে আমার হাতে তুলে দিলো ওদের ক্যাম্প ডাইরী দুটো।

আঠেরো বছর আগে, লেখা ও আঁকায় বর্ণনা করা ডাইরী দুটো খুলে ধরলাম পাঠকদের কাছে।

ইমলীর ডাইরী ঃ

(২৬/১২/৯৮, আম ঝর্ণা day-out camp, 2-30 pm.) ফাটাফাটি জায়গা। I like it. দুটো পাহাড়ের জঙ্গলে ঢাকা ঢাল যেখানে মিশেছে সেটাই আম ঝর্ণা। যে কোনও সময়েই জল খেতে আসবে হাতির দল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা কোরাস। দিনের বেলাতেও অন্ধকার। ব্যাগ ভর্তি করেছি সাদা মিছরির মতন কোয়ার্জ পাথরে। স্কুলের Geography teacher-কে দেখাবো। মিতা দি আর সুভাষদার সাথে খিচুড়ি রান্নায় হাত লাগিয়েছে সুমেধা আর তন্ময়। ঝর্ণার জল কি মিষ্টি, ভাবছি আর বাড়ি ফিরবো না।

তুতানের ডাইরী ঃ

(2-30 pm.) আম ঝর্ণার জলের নীচে পাথর সরিয়ে অনেকগুলো কাঁকড়া ধরেছি। পরশদা শিখিয়ে দিলো কায়দাটা। ক্যাম্পে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নুন লেবু দিয়ে খাবো। গোবর দেখে তন্ময় বলল, ওগুলো নাকি হাতির 'পটি'। আশেপাশের জঙ্গলের গাছগুলো একেবারেই অচেনা। জলের কাছাকাছি অনেক 'গ্রাস হপার' দেখলাম। আসবার পথে 'Indian Roller' মানে নীলকণ্ঠ পাখি দেখেছি। এত লোকজন একসাথে হলে পাখি দেখা যায় নাকি? সৌমেনদা বোধ হয় মজা করেই বলল, এখানে নাকি রাত হলে ভূতেরাও আসে।

'আমলকীতলা' Survival Camp (বিকেল 5-00 p.m.) তুতানের ডাইরী ঃ দুপুরের পর থেকে যা যা বাজে কাজ হওয়ার ছিলো, সব হল আমাদের সাথে, মানে আমার আর ইমলি দিদির সাথে। আমরা এখন জঙ্গলে একা, একদম একা। পথ হারিয়েছি। প্রথমে বন্ধুদের, আর তারপর ক্যাম্পে ফিরবার চেনা পথটাও হারালাম। এখন সামনে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। চারদিকে ঘিরে রয়েছে অচেনা চেহারার পাহাড়। খিচুড়ি খেয়ে, আরো কাঁকড়ার লোভে আমি আর ইমলি দিদি আম ঝর্ণার অনেকটা ওপরে উঠে এলাম। কাউকে বলেও আসি নি। তারপরেই এলো ঝড়। আশ্রয় নিলাম একটা পাথরের নীচে। ফিরে এসে দেখলাম কেউ নেই। কত চিৎকার করলাম, Survival Kit-এর হুইসেল বাজিয়ে সিগনালিং করেও লাভ হলো না। আমার কান্না এসে গেল, মার মুখটা মনে পড়ছে। আর কি কখনও বাড়ি ফিরতে পারবো?

ইমলির ডাইরী ঃ

Situation under control. মনে মনে বললাম — Imli, you have got a real survival camp, just do it. ক্যাপ্টেন (আমি আগে জানতাম না, camper-রা যে আড়ালে আমাকে এই নামে ডাকে।) এই অবস্থায় থাকলে অবশ্যই বলত - Be calm. মোট কথা এই camp-টা আমি Lead করছি। তুতান সাথে আছে, খুব smart camper. আমার বিশ্বাস, ক্যাপ্টেনের camp-এর লোকজন ঠিক খুঁজে পাবে আমাদের। খুব বড় একটা ভুল করে ফেললাম, আম ঝর্ণা ছেড়ে বেড়িয়ে এসে। তারপরই তো পথ হারালাম। Location, direction সব এলোমেলো হয়ে গেছে। সাথে একটা map থাকলে এই অসুবিধা হতো না। Map reading-টা আমি ভালোই জানি। আমার মন বলছে, কাল সকালে সামনের ওই high point-য়ে উঠলেই আমাদের Location বুঝতে পারবো। এখন অন্ধকার হয়ে আসছে, আমরা বোধ হয় রাস্তা ভুলে পাখি পাহাড়ের পিছন দিকে চলে এসেছি। আগুন জ্বালিয়ে Signaling করলেও কারও চোখে পড়বে না।

(সন্ধ্যা 7-00 p.m.)

Night out-এর জন্য একটা Safe জায়গা পছন্দ হয়ে গেল। নাম দিলাম, 'আমলকী তলা'। একটা সরু আমলকী গাছের গায়ে improvised shelter বানিয়ে ফেললাম Plastic Sheet দিয়ে। দড়ি কম পড়ে ছিলো, তুতান ওর জুতোর ফিতে দুটো কাজে লাগালো। নীচের ঝোরা থেকে রাতের মতন দু-বোতল খাওয়ার জল এনে রাখলাম, অন্ধকার হওয়ার আগে। দুজনে হাত লাগিয়ে প্রচুর জ্বালানী কাঠ প্রথমেই এনে জমা করেছিলাম। কাঠপাতা অল্প ভিজে থাকায়, আগুন জ্বালানোটা বেশ Challenging ছিলো, But Tutan done a good job. গুছিয়ে বসলাম আগুনের পাশে ডাইরী লিখতে। এক কাপ গরম চা হলে ভালো হতো। অন্ধকারের কালো চাদরে ঢাকা পড়েছে চারিধার। টুনিলাইটের মতন জোনাকী পোকা জ্বলছে-নিভছে। নিঃস্তব্ধ চারিদিক, নিজের হার্টবীটও যেন শুনতে পাচ্ছি।

তুতানের ডাইরী ঃ

(7-00 p.m.) আগুনের পাশে বসে দুজনে ডাইরী লিখছি। মনে হচ্ছে, কত গভীর রাত। একটু আগেই ইমলি দিদির back pack থেকে আবিষ্কার হলো সকালের না খাওয়া তিনটে লুচি আর অল্প আলুর দম, অর্ধেক বিস্কুটের প্যাকেট, আমার কাছে ছিলো এক প্যাকেট বাদাম আর একটা ক্যাডবেরী বার। ওফ্

Grand dinner হবে। তবে নুন-লেবু ছাড়া কাঁকড়াগুলো পুড়িয়েও খেতে পারলাম না। পকেট থেকে অনেকগুলো বনকুল বের করলাম। বলাই হয় নি, Wax paper ছিলো বলেই ভেজা কাঠ-পাতায় আগুন ধরাতে পারলাম। খুব ঠান্ডা। খিদেটাও পেয়েছে খুব। ইস্ দুপুরের খিচুড়িটা যদি সাথে রাখতাম ...

বেস ক্যাম্পে সবাই এখন কী করছে? ওরা কখন বুঝতে পারলো যে আমরা নেই? বাড়িতে কী আমাদের হারিয়ে যাওয়ার খবর দিয়েছে? মা-বাবা যদি শোনে, তবে আর হয়তো কখনও আসতেই দেবে না।

(9-00 p.m.) : জঙ্গলের কত রকম আওয়াজ। প্রথমটাতে গা ছম্‌ছম্ করলেও এখন ভয়টা কেটে গেছে। ঠিক হয়েছে, আমরা দুজনে একসাথে ঘুমাবো না। তিন ঘন্টা, তিন ঘন্টা পালা করে ঘুমাবো। প্রথমে ঘুমাবো আমি। Good Night.

ইমলীর ডাইরী ঃ

(11-00 p.m.) : আমি আগুনের পাশে, মাঝে মাঝে কাঠ ঠেলে দিয়ে আগুনটাকে জাগিয়ে রাখছি। তুতানকে আমার উলের টুপি আর মোটা জ্যাকেটটা দিতেই, গরম পেয়ে Shelterয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ আকাশ ঝক্‌ঝক্ করছে, কত তারা। কালপুরুষ এখন মাথার ওপরে। লুব্ধক এখনও পাহাড়ের পিছনে, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি বৃষ রাশি। একটু ভালো করে খুঁজলে স্বাতী নক্ষত্রও হয়তো চোখে পড়বে। মিহির জ্যেঠু পাশে থাকলে হয়তো আরো অনেক নতুন তারার নাম জানতে পারতাম।

(3-00 a.m.) : এই মাত্র ঘুম থেকে আমায় উঠিয়ে, তুতান শুতে গেল। ঘুম তাড়াতে মেসটিনে গরম জল বসিয়েছি। কাঠ ফুরিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে দূরের কালো গাছগুলোর পাশ থেকে কেউ বোধ হয় উঁকি মেরে আমাদের দেখছে। হাতের কাছে একটা মোটা লাঠি রেখেছি। খুব ঠান্ডা।

২৭/১২/৯৮ (সকাল 7-00 a.m.) ঃ

Good Morning করলো তুতান। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। আগুন নিভে গেছে, সাদা ধোঁয়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠছে। গত রাতের সব ঘটনাই যেন স্বপ্নের মতন লাগছে। শিশিরে সারা গা ভিজে। তুতান বোকার মতন আগুন বড়ো করতে ভেজা শাল পাতা দিতেই গল্‌গল্ করে সাদা ধোঁয়াতে চারদিকে ভরে গেল। অবাক কান্ড। মিরাকল, ম্যাজিক। সাদা ধোঁয়া দেখতে পেয়ে সামনের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দেবদূতের মতন নেমে এলো মহেন্দ্র কাকা, সুনীলদা, অনুপমদা সাথে দুজন অচেনা গ্রামবাসী। ইয়া হু ...।

ডাইরী পড়া শেষ হতেই ফোন লাগালাম তুতানকে, মানে এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডোগরা রেজিমেন্টের মেজর তুষার মিত্রকে, আর ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলের চিফ্ ফিল্ড ফটোগ্রাফার ঈশানী মিত্র, মানে ইমলিকে। আমি তো এখনও ওদের 'ক্যাপ্টেন' হয়েই আছি।

ইমলির ডাইরীতে আঁকা আমলকী-তলায় তুতানের হাত গরম করার ছবি, পিছনে তাদের রাতের আশ্রয়স্থল,

সুঁড়িপথ

সায়ন্তন ঠাকুর

রোগা সুঁড়িপথটা থমকে এসে দাঁড়িয়েছে এক প্রাচীন জনজাতির জীবনযাপনে। জঙ্গলের মাঝে সিঁথিকাটা পথ। দুপাশে শুধু শাল আর শাল। যুবক এবং উদ্ধত। আর আছে নেশার গাছ মহুয়া। গাছের তলা ফুলে ফুলে লাল। তাদের গোড়ায় কবেকার উইঢিপি। ঘন খয়েরি রং-এর ছোপ তাদের গায়ে। অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে পাথুরে জমির ওঠানামা। লাল পাতার কুসুম গাছ চোখ টেনে ধরে, কানে ঝিম ধরে আসে "কড়ায়ার ন এঁয়দা এঁয়দা/য়ায়ার সোনা/বেঙ্গাল করিয়ো য়ায়ার" অজানা শব্দের সুর। বাস্তারের জঙ্গল শুরু হয় ক্রমশঃ।

কোন্ডাগাঁও পার হয়ে নারায়ণপুরের রাস্তা। আমাদের এতদিনের পালিশ করা জীবন চর্চার ভিত নড়বড়ে করে দিয়ে যে পথ চলে যায় অবুঝমাড়ের দিকে। আমাদের কিছুই করার থাকে না আর, অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখি বৃষ্টি ... অরণ্যের সীমানা প্রান্তে কয়েকটা তেঁতুল গাছ, কুঁড়েঘর আর চাষ জমি। গ্রামের নাম কুরান্ডি। দু-ফেরতা ধুতি লুঙ্গি করে পরা একজন কোদাল দিয়ে অনন্তের জমি কোপাচ্ছেন - এই সময় চাকার ওপারে একটু পরেই দেখা মেলে এক স্বচ্ছ জলের পুকুর। পায়ে চলা পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলি ডোংরিগুডার রাস্তায়। ডোংরি মানে পাহাড়, আমাদের কাছে সেখানে বাঁচে একদল মানুষ, তাদের বহু পুরনো লোভ-পাপ-পূণ্য-ধর্ম-অধর্ম নিয়ে এক আশ্চর্য জীবন চর্চায়। এঁরা সবাই মাড়িয়া। মাড়িয়াদের গ্রামে শুরু হয় রাতের উৎসব, কাঠের আগুন ঘিরে বসে থাকি আমরা ক'জন, মাথার ওপর অনন্ত নক্ষত্রবীথি অন্ধকারে। দু-একটি আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ছে রাতের গায়ে। বহু জন্মের স্মৃতি পাক খায় আমাদের মাথার ভিতরের অলিগলি জুড়ে, দাড়ুঙ্গো আর সলফির নেশা উসকে দেয় তাকে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকিয়ে ওঠে আদ্দিকালের স্তব্ধতা। ভেসে আসে এক নাম-না-জানা বাঁশির আওয়াজ, ঘোটুলে যাওয়ার সঙ্কেত ইশারা। আমাদের আসর থেকে উঠে দাঁড়ায় তিন সোমত্থ কিশোরী। তারপর মিলিয়ে যায়। আগুন নিভে আসে ক্রমে, হিম মাখা এক অতিকায় চাঁদ ওঠে আমাদের মাথার ওপর। অর্থহীন কিছু ধ্বনি শুরু হয় চারপাশে। রে রে লোয়ো/ রেলো রেলো রেলো রে / রে রে লোয়ো / রেলো রেলো রে রে লয় / রেলো রেলো / রা লোরে রেলো / রেলো ... স্পষ্ট হয় এক অপূর্ব সুরের অবয়ব, গোন্ডি ভাষার সেই গান ভাষার দেহ ত্যাগ করে উড়ে বেড়ায় এই জঙ্গল পাহাড়ের আনাচে কানাচে।

রাত শেষ করে নেমে আসে চৈত্রের ভোর, কুসুম বনের গন্ধ লেগে থাকে সেই সকালের গায়ে। অলস দিন শুরু হয়। নিরবিচ্ছিন্ন এক অবকাশ। যে অবুঝমাড়িয়া যুবকটি একমনে কাঠ কেটে চলেছে সময় চুপ করে বসে থাকে তার পাশে। সেই অবসরে শুধু এই বনপাহাড়ের দেবী প্রকাশ করে চলেন তাঁর বিচিত্র রূপ। একটা বাড়িতে দেখা যায় মাছ শুকিয়ে রাখার আয়োজন, কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো লোহার জাল-চারকোণায় দড়ি বেঁধে ঝোলানো। নীচে কাঠের আগুন জ্বলছে। হালকা আঁচে মাছ হয়ে উঠছে অতি সুস্বাদু। গোল্ড জাতির শাখা, এক ভাতরা নারী আয়োজন করে চলেছেন এই রান্নার। কোলে তাঁর ঘুমন্ত শিশু। দুই শহুরে যুবককে দেখি দ্রুত পায়ে এই জনপদ পার হয়ে সরু জংলা পথে মিলিয়ে যেতে। নৃতত্ব এদের বিষয়। জংলা পথটি কিছুদূর এসে হারিয়ে যায় সিংমাড়িয়াদের সমাধিভূমে। ডোঙ্গরদেহি যাদের দেবী। ক্লান্ত দুই যুবক হতবাক বসে থাকে মৃতদের সেই রাজ্যে। প্রাচীন শাল গাছের দেহে খোদাই করা মৃতের জীবন কথা এই সমাধিভূমির নির্ভুল এপিটাফ। দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চুপ, একাকী। এই অরণ্যাণীর প্রতিটি মৃতের শোক বহন করে সে। তার ক্লান্তি নেই, প্রতি রাতে সে দেখে এই বনপাহাড়ের দেবীর অলৌকিক পায়ের শব্দ। জীবিতের শোক সে গ্রহণ করে না, সময় শুরুর আগে থেকে তার এই অক্লান্ত জাগরণ। ডোঙ্গরদেহীর কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অনেকদিন পর এই দুই আগন্তুকের সামনে সে প্রকাশ করতে চায় তার গোপন স্বরূপ। একজনের মনে পড়ে যায় তার নিজের ছেলেবেলার কথা। সমাধির ফাটলে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে সে মৃতের ভাষা। পরে যতবার সে নারীর গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছে, ততবার তার নির্ভুল মনে পড়েছে সেই না-শোনা শব্দ। ওদের দেখা আর না-দেখার মাঝে এই সময় সুঁড়িপথ ধরে মিলিয়ে যায় এক মিশকালো মানুষ। এক শর্তহীন আহ্বানে ভর করে তারা দুজন এগিয়ে যায় ক্রমশ আরও গহীন জঙ্গল-রাস্তায়। গাছেদের মিছিলে যেখানে আটকে পরের দিনের আলো। চার কিলোমিটার পথ আগুন জ্বালিয়ে দিতে থাকে তাদের আজন্ম লালিত সংস্কারে। জানতেও পারে না, তাদের পরবর্তী সুখের জীবন বদলে যাবে আমূল। নিওলিথিক যুগের এক শিলাখন্ডের টানে তারা এগিয়ে যায়। যার স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে আছে এক জনজাতির কামনা-বাসনার জীবন। ডোঙ্গরদেহীর রূপ ধরে যে বলে, দেখো আমি-ই সেই, যে অখন্ড চরাচর জুড়ে ভেসে

থাকি। আমি-ই সেই অলৌকিক যে তোমাদের আর্য অহংকার প্রতি পদক্ষেপে মুছে ফেলছি। এই বন পাহাড়ে আমি-ই মায়া তোমাদের। আর কিছুই করার থাকে না। ওদের নাগরিক জন্ম ওদের দেহ ছেড়ে চলে যায়, একাকী। ওই সিং-মারিয়াদের সমাধি-ভূমে পড়ে থাকে নিশ্চুপ।

ফিরে আসার পালা এগিয়ে আসে। এ লেখাও তার নিয়তি মেনে পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে। ফেরার আগের দিন চৈত্রের রোদ তেতে ওঠে। ছায়াহীন রাস্তায় বসে থাকে যুবকটি। সে তখনও জানে না, মানুষের সভ্যতা তাকে ছেড়ে চলে গেছে চিরতরে। এই খাঁ খাঁ দুপুরে তার মনে পড়ে কত জন্ম আগে অবুঝমাড়িয়াদের থেকে শেখা ভাতরাদের অলৌকিক জীবন চর্চার কথা। তাকে শুনিয়েছে সুকালু ভাতরা, অনাস্বাদিত সেই গোপন কথা। যুবকটির সমস্ত বোধ আজ অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে চল্লিশ হাজার বছর ধরে চলে আসা এক জীবন প্রবাহের কাছে। যাদু-বাস্তবতার দোলায় তার মস্তিষ্ক নিস্ক্রিয় হয়ে আসছে ক্রমশ। যুবকটি নির্ভুল বুঝতে পারছে তার জীবনে আসন্ন এক বাঁকের ইশারা। এই প্রিয় বসন্ত দিনে তার জাগ্রত তন্দ্রায় হানা দিয়ে যাচ্ছে বারবার সেই রোগা সুঁড়িপথ, যে পথ তার গলিঘুঁজির রহস্যে হারিয়ে যায় সিং-মাড়িয়াদের পরিত্যক্ত সমাধিভূমে। সে তখনও জানে না এই সুঁড়িপথ তাকে আর কখনও ছেড়ে যাবে না। নিরুপায় যুবকটিকে বারবার ফিরে যেতে হবে সাদা ক্যানভাসের কাছে। সেটিই তার নিয়তি। চৈত্রের বনপাহাড় ততক্ষণে জেগে উঠেছে শেষবেলার অপরূপ সাজে। মহুয়ার রং-আগুন লেগেছে পাহাড়তলির কিনারে। তার ওপারে টিড়িয়া জঙ্গলের পুরনো, অনেক পুরনো গাছেদের ভীড়ে ফুরিয়ে আসছে আজকের দিন। কালকে সে ফিরৎ যাবে, তার কোলকাতায়। শেষ হবে এই বল্গাহীন স্বাধীনতার দিনলিপি, যা শুধু উসকে দেয় মানুষের জিনের এক আদিম-স্মৃতি।

এক প্রবল বসন্তদিনে সে ফিরে আসে কোলকাতা। কোলকাতার বুক জুড়ে তখন সকাল। যুবকটির মাথার ভিতর জুড়ে তখন রং আর রং-এর বন্যা-একদল মানুষের, মাথায় বাইসনের সিং পরে নাচার শব্দ শুধু। তারপর সাদা ক্যানভাস ভরে ওঠে অলীক সব রেখা আর রং-এর বিন্যাসে। ভেসে ওঠে সিং-মাড়িয়াদের সমাধিভূমের সেই এপিটাফ। এই শহরের পাঁজরা ভেদ করে তার জন্য তৈরী হয় এক অন্য এসকেপ রুট, একটি পালাবার রাস্তা। যে রাস্তার হাওয়া-ভাঙাচোরা জঞ্জাল আর ক্বাথ জড়ানো ফুসফুসে চারিয়ে দেয় আদিম স্বাদ। চোখ বুজলেই যেখানে বহুদূর ছড়ানো আকাশ, উইটিপি গায়ে নিয়ে উদ্ধত শালের সমুদ্র, একটা রোগা সুঁড়িপথ আর ডোঙ্গরদেহীর মায়া, এখনও। আবার একদিন কোলকাতা জুড়ে মেঘ করে আসে। ঘুম ভেঙ্গে যুবকটি দেখে বুকের ওপর নেমে এসেছে মেঘ। চোখ জলে ভরে ওঠে। অবধারিত তার মনে পড়ে সেই কুরান্ডির রাস্তা, দুপাশের বনরাজির সীমারেখা, একটা তারাও আর সেই দেবী, আজও যিনি বিছিয়ে রেখেছেন তাঁর নিপুণ মায়া সেই বনপাহাড়। যুবকটির জীবনের একটি পর্ব শেষ হয় এভাবে। ওর বন্ধ চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই লোকটি বারবার, বলি ভাতরা, জমি চাষ থামিয়ে যিনি কালচক্রের ওপারের উদাসী শব্দে ওদের জানিয়েছিলেন, "ফির মিলেঙ্গে-আগলে জনম মে"। ওদের আর ফিরে যাওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না। ওদের নাগরিক জীবনচর্চার ভিতে আমূল গেঁথে গিয়েছিল ওই নির্বিকার আদিম উদাসীনতা। হয়তো আবার একদিন কোলকাতার পাঁজরা ভেদ করে বয়ে যাবে অবুঝমারের বাতাস। যুবকটি ফিরে যাবে অথবা আর ফেরার রাস্তা থাকবে না ওর। গল্প জমে উঠবে, আঙুলে নিশপিশ করবে বিন্যাস আর রেখা, রক্তে অনতিক্রম্য ডাক পাঠাবে রোগা সেই সুঁড়িপথ। আবার শুরু হবে সেই আদিম উন্মোচন।

প্রসঙ্গ ভ্রমন

মেগাস্থিনিস এদেশে বহু বছর কাটিয়ে গেছেন। যদিও ঠিক কত বছর তা জানা যায় না। তাঁর কোন ছবি বা প্রতিকৃতি নেই। দীর্ঘদিন এদেশকে ঘুরে ফিরে দেখে শুনে, লিখেছিলেন তাঁর ভ্রমনকাহিনি ইন্ডিকা। সে বই এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। তবু তাঁর রচনা যে এখনও বেঁচে আছে, সে হল তার সমকালের অন্যান্য ইতিহাস রচয়িতাদের রচনার মধ্যেকার উদ্ধৃতির ডোরে। মেগাস্থিনিস থেকেই প্রচুর উপাদান পেয়েছিলেন তাঁরা। সেইসব ছড়ানো ছিটানো অংশ জুড়েই মেগাস্থিনিসের বিবরণ।

লাল মাটির দেশে কিছুদিন

মানসী পুরকায়স্থ

তোমায় ছেড়ে যেতেই হবে এবার।
তোমার ওই কৃষ্ণচূড়া আকাশে
জামরুলের গন্ধ ছড়ানো হাওয়ায়
সোনাঝুরির হলুদ ফুলের নরম রেণুতে
পা ডুবিয়ে,
লালমাটির কণায় কণায় আমার চলার চিহ্ন
সব —
সব ছেড়ে এবার চলে যাবার ক্ষণ এল।

শ্রাবণের গর্ভিনী কোপাই,
বাবুলাল-সোনামন আদি মানবীর
মন দেওয়া-নেওয়া।
এলোমেলো খোয়াই ধরে রহস্য নীল
গাছের খসখসানি;
সুঠাম গোধূলি
সব —
সব ছেড়ে ডাক এল চলে যাবার।
তোমার ভিতরে নিজেকে যাপন করেছি —
লালন করেছি এই আমিকে তোমার আদরের চাদরে।
এমন আপন আমার কেউ ছিল না,
কাউকে পাইনি এমন আপন করে।
তোমার নিবিড় ছোঁয়া আমার শরীর জুড়ে,
মন জুড়ে তোমার আদরের অনুভূতি।
আমার ব্যথায়, আমার আনন্দে, আমার শোকে, বিস্ময়ে
শুধু তুমি!
তোমার তীব্র ভর্ৎসনায় কেঁদেছি কত!
তোমার নিবিড় আলিঙ্গনে পিষ্ঠ হয়েছি বার বার।
এবার সময় হল বিদায় নেবার;
ক্রমশ মিলিয়ে যায় পৌষের বাউল বাতাস।

সীমান্ত

নন্দিতা সিনহা

মাঝখানে কাঁটাতার শুয়ে আছে
দুই পাশে সীমান্তের প্রহরী।
মিটার দুই কাঁটাতার পেরোতে ছাড়পত্র লাগে।
সীমান্ত দেখতে আসা কিছু মানুষ দুই পাড়ে
এক বাতাস শরীরে শিরশিরানি জাগায়।
কাঁটাতারের ভেতর আটকে আছে একটা ছাগল
যে ভূগোল এবং ব্যবধান চেনে না -
সবুজ ঘাস চেনে।
কচি সবুজ ঘাসে ভরে আছে তারে ঘেরা মাটি
বহু বছর কেউ পা রাখে না ওখানে।
এ পারের গাছ ও পারের গাছকে নিঃসংকোচে জড়িয়ে থাকে।
দুই সীমান্তের রোদের গন্ধ এক
ধুলোর রঙ একই রকম রাঙা।
ওদের ট্রেনের শব্দ এ পারের শব্দের সহোদর।
প্রহরীর গায়ে পোশাকটুকু ছাড়া কোন বিভেদ নেই।
রাজা উজীরের খেয়াল খুশির মাশুল গোনে মানুষ
কাঁটাতারের রক্তে লাল হয় পদ্মা, আত্রেয়ী, যমুনা।
জোড়া ভেঙে একটা শালিক উড়ে গেছে ওপারে।
দু দেশের সব শিশু তাই ঘুম ভেঙে
এক শালিক দেখে।
ইতিহাসের কেটে দেওয়া গণ্ডীর দুইপাশে
থমকে যায় গণ্ডীছুটের বাসনা।

আমার মানস ভ্রমণ

(শেষাংশ)

(প্রথম অংশ শারদ সংখ্যায় ১৪২৩ প্রকাশিত)

অসিত সরকার

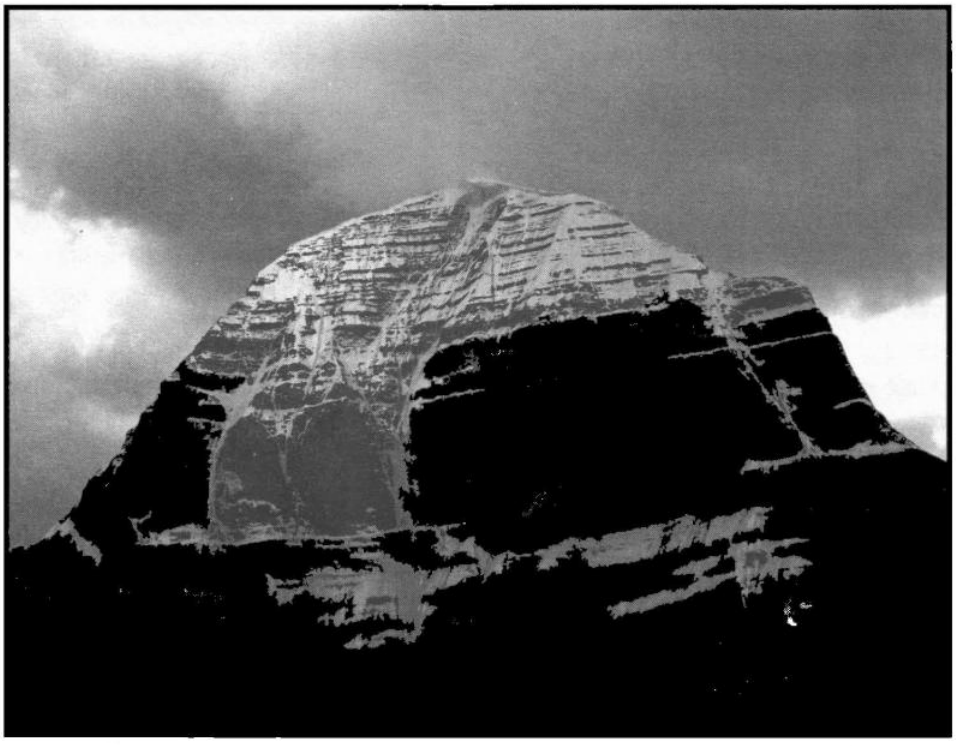

কৈলাস পর্বত ছবি - লেখক

আন্তর্জাতিক সীমানার ওপারে

চারিদিক বরফে ঢাকা। ৫৩৩৪মিঃ উচ্চতায় ফুট তিনেক চওড়া লিপুলেখ পাস। ঝোড়ো হাওয়ায় শরীর অসাড় হয়ে পড়ছে, গ্লাভস-এর ভিতর হাতের আঙুল নির্দেশ মানতে চাইছে না। আমরা, কেবল যাত্রীরা চীনা ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছি। সামনেই প্রায় ৩০০মি. লম্বা খাড়াই বরফের ঢাল। আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় পুরোটা একইরকম। কোনোরকমে পিঠের উপর শুয়ে পড়তেই মুহূর্তে নীচে চলে এলাম। ওখান থেকে ৩কি.মি. দূরে বাস, চাইনিজ গাইড অপেক্ষায় ছিল। ২০কি.মি. দূরে টাকলাকোট শহরে ইমিগ্রেশন সেন্টার হয়ে এখানকার অতিথি ভবনে দু'দিনের বিশ্রাম। দিল্লী থেকে এ পর্যন্ত যত পর্যটন নিবাসে থেকেছি, এখানকার বন্দোবস্ত তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল ও উন্নত। সামনে দুপাশে ফুটপাথ সহ ৬ লেনের বিশাল রাস্তা। বিশালাকার চাইনিজ ব্যাঙ্ক অফ এগ্রিকালচার থেকে চাইনিজ মুদ্রা ইউয়ান সংগ্রহ করলাম। (১ ইউয়ান = ৯ টাকা)। আমাদের ৫১ পরিবারের বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাত্রে বড়া খানা খেলাম। মানস সরোবর ও কৈলাস পরিক্রমার প্রধান প্রবেশদ্বার এই টাকলাকোট।

দুইদিন বিশ্রামের পর বাসে করে আমাদের গন্তব্য ৯৪০ কিমি. পার হয়ে কৈলাস পরিক্রমার বেসক্যাম্প দারচেন বা

তারচেন (৫৯৩২মি., ১৬৮৩৫ ফুট)। জনমানবহীন ঝকঝকে চওড়া মসৃণ রাস্তা সিসিটিভি ক্যামেরা। দুপাশে বিভিন্ন রংয়ের ন্যাড়া খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের ঢালে বিশালাকায় চমড়ি গাই ও ভেড়া দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনে চেকপোষ্ট-এ বাস দাঁড়িয়ে পড়ল। দুপাশে দুটি ছোট খুঁটির মধ্যে সুতোর মত দড়ি ঝুলছে। বাঁদিকে ছোট ঘরে একজন বসে আছে। গাইড এবং ড্রাইভার কাগজপত্র নিয়ে ঐ ঘরে গিয়ে ১৫ মিনিট বাদে ফিরে প্রথমে সুতোটি নামিয়ে রেখে, বাস পার হবার পর আবার সুতো তুলে দিল। কংক্রিটের রাস্তা, চড়াই-উতরাই আছে, রাস্তার দু'ধারে পাহাড়ের মাঝে ধূ ধূ ধূসর প্রান্তর। সামনের পাহাড়ের পাস অতিক্রম করতেই নজরে এল টলটলে ঘন নীল বর্ণের এক বিশাল লেক (৭০ বঃ কি.মি.)। লেকের ধারে বাস দাঁড়াল কিন্তু গাইড জলে নামতে নিষেধ করল, যদিও এর নয়নভোলানো রূপ সবাইকে আকর্ষণ করছে, কারণ এটি অভিশপ্ত। রাবণ রাজার কৈলাস শৃঙ্গে মহাদেবের আলয়ে যাবার অসফল প্রচেষ্টায় নির্গত ঘাম থেকে তৈরি এই রাক্ষসতাল। কোন জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণী এই জলাশয়ে নেই বা এর আশেপাশে বা উপরে কোন পাখী দেখা যায় না। এর পিছনে তুষারশুভ্র শৃঙ্গসহ গুর্লা মান্ধাতা পর্বতমালা (৭৬৯৬ মিঃ, ২৫২৪২ ফুট)।

এই পথে এগিয়ে যেতেই ঠিক অপর পারে আর একটি জলাশয়, বহু কাঙ্খিত স্বপ্নের মানস সরোবর। এর ঠিক পিছনে কৈলাস পর্বত। স্বল্প সময়ে বহু যাত্রীর বিভিন্ন সোনার বিগ্রহকে সরোবরের জলে অভিষেক ও পূজা সম্পন্ন করল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে দারচেনে আমাদের অতিথি নিবাস পৌঁছে গেলাম। ভারতবর্ষের যে কোন তীর্থক্ষেত্রের মতো এখানেও বিভিন্ন স্মারকের অজস্র দোকান রয়েছে। দুপুরে খাবার পর এখান থেকে ৪ কিমি. নুড়ি পাথর বিছানো রাস্তায় ছোট নদী পার হয়ে 'অষ্টাপদ' এলাম। রাস্তায় প্রচুর পাহাড়ী ইঁদুর আমাদের হাত থেকে বিস্কুট নিল। এই অষ্টাপদ জৈন সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্র। ছোট আটটি স্তরের পাহাড়, মানুষের জীবনের আটটি ধাপের সাথে সামঞ্জস্য আছে। এর ডানদিকে নন্দী পাহাড়। মাঝখান কৈলাস পর্বতের দক্ষিণ দিক দৃশ্যমান।

আজ থেকে (১৯শে জুন, ২০১২) কৈলাস পরিক্রমা শুরু। হিমালয় পর্বতমালার কৈলাস পর্বত শৃঙ্গ (৬৬৪০ মি., ২১৮০০ ফুট)। আকারে বর্গাকৃতি পিরামিডের ন্যায় এবং অবস্থানগত দিক থেকে পৃথক হবার জন্য পরিক্রমা সম্ভব। এর চারদিকে চারটি বড় নদীর উৎস। যথা, উত্তরে সিংহ মুখ থেকে ইন্দাস, পূবে ঘোড়া মুখ থেকে সুৎলেজ বা শতদ্রু দক্ষিণে ময়ূর মুখে কারনালি এবং পশ্চিমে হস্তী মুখে ব্রহ্মপুত্র। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে কৈলাস পর্বত ও পরিক্রমা অত্যন্ত পবিত্র। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ে বিশ্বাসীরা কৈলাসকে মধ্যমণি করে বাঁদিক থেকে ডানদিকে পরিক্রমা করে কিন্তু তিব্বতীয় বণ্ সম্প্রদায় বিপরীত দিকে প্রদক্ষিণ করে।

দারচেন থেকে বাসে খুব খারাপ রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে যমদুয়ার বা যমদ্বার পৌঁছলাম। এখানে ছোট একটি মন্দির প্রদক্ষিণ করে কৈলাস পরিক্রমার ট্রেকিং শুরু। নামকরণ থেকে অনুমেয় সামনের পথ দুর্গম ও বিপদসংকুল। জায়গাটার নাম তারবোচে, এখান থেকে পরিক্রমার পনি ও পোর্টারও পাওয়া যায়। লাংচু (Lahm Chu) নদীর ধার দিয়ে রাস্তা। ১২ কিমি. চড়াই পথ ধরে ডেরাপুক (৪৮৯০ মি., ১৬০৪০ ফুট) এলাম প্রায় ৫ ঘন্টায়। পথ বেশি চড়াই না থাকার জন্য ক্লান্তি নেই। দুপুরে খাবার পর ৪ কিমি. দূরের চরণস্পর্শ দর্শন করব। রাস্তা কিছু নেই, চারিদিকে কেবল বোল্ডার ও বরফের চাঁই। কিছুদূর যাবার পরেই ছোট বরফের কুচি পড়তে লাগলো। আশ্রয়ের কোন জায়গা নেই। বর্ষাতি ও ছাতার সাহায্যে আমরা এগোলাম। শিলাবৃষ্টি বন্ধ হয়ে আকাশ পরিস্কার হল। সামনে কৈলাসের পাদদেশ থেকে সাদা বরফের ঢল নেমে এসেছে। আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটাই চরণস্পর্শ (৫১৮৩মি., ১৭০০০ ফুট)। কি অপূর্ব অনুভূতি। সর্ব্বশক্তিমান মহাদেবের পদতলে দাঁড়িয়ে তাঁর পদধূলি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। সার্থক আমার কৈলাস যাত্রা।

পরের দিন ভোরবেলা ডেরাপুক থেকে বেড়িয়ে খরস্রোতা নদী পার হয়ে এগোলাম। দূরের পাহাড়কে অতিক্রম করে যেতে হবে। আরও ঘন্টাখানেক বাদে নজরে এল পাহাড়ের উপরে যাবার তিন কিমি. খাড়াই পথ। ধীরে ধীরে উপরে উঠলাম। চারিদিকে তুষারশোভিত পথে যাত্রীরা এগিয়ে চলেছে। মিনিট পনেরো পথে এগিয়ে দেখি বিভিন্ন রংবেরংয়ের পোষাকে প্রায় শ'দুয়েক মানুষের সমাবেশ। বিভিন্ন রংয়ের প্লাস্টিকের ধর্মীয় পতাকায় চারিদিকের পুরো বরফ ঢাকা পড়ে গেছে। বুঝতে পারলাম, পরিক্রমার সর্বোচ্চ উচ্চতায়, দোলমা লা বা দোলমা পাসে (৫৬৭০মি., ১৮৫৯৭ ফুট) আমার অবস্থান। সবাই আনন্দে আত্মহারা, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ছবি তোলার হিড়িক।

আমি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত। মনে হচ্ছে পৃথিবীর মাথায় আছি। সব ক্লান্তি নিমেষে উধাও। কি অপূর্ব দৃশ্য! দূরের শৃঙ্গগুলি থেকে সদ্য ওঠা সূর্যকিরণে বর্ণময় আলোক ছটায় দিগন্ত বিস্তৃত। সার্থক আমার কৈলাস পরিক্রমা। মনে মনে সর্বশক্তিমান দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলাম।

খানিকটা এগিয়ে প্রায় ১০০০ ফুট নীচে গোলাকার ঘন সবুজ রংয়ের জলের কুণ্ড, পবিত্র গৌরিকুণ্ড। কথিত আছে দেবী পার্বতী এখানে স্নান করেছিলেন এবং গণেশের জন্ম এই কুণ্ডতে। তাই এটি গণেশকুণ্ড নামেও পরিচিত। আমরা উৎরাইয়ে চলেছি। নীচে নামতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। প্রায় ৩ কিমি. উৎরাই পার হয়ে আবার একের পর এক ছোট পাহাড় পার হয়ে বেলা ২টো নাগাদ ১৮ কিমি. অতিক্রম করে জংজেরবু বা জুতুলপুক (৪৭৯২মি., ১৫৭২০ ফুট) পৌঁছে রাত্রিবাস ও বিশ্রাম।

আজ ২১শে জুন ১০ কি.মি. সহজ ট্রেক করে বারখা বা পারখাতে আমাদের বাসের দেখা পেলাম। এখানেই কৈলাস পরিক্রমার শেষ। এখান থেকে রাক্ষসতাল আর তার পিছনে গুর্লা মান্ধাতা পর্বতমালা (৭৬৯৬ মি., ২৫২৪২ ফুট)। বাসে ৪ কিমি. আধঘন্টার মধ্যে দারচেন ফিরে এলাম।

পবিত্র কৈলাস পরিক্রমা শেষ করে আজ ২২শে জুন আমাদের মানস সরোবর পর্ব শুরু হবে। এই সরোবর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে অতি পবিত্র। হিন্দুমতে দেবাদিদেব ব্রহ্মার মনের মধ্যে এই সরোবরের ভাবনা আসে যা পরবর্তীকালে 'মানস সরোবর' নামে অবস্থান (পরিধি ৮৮কিমি., গভীরতা ৩০০ফুট)। কথিত আছে স্বর্গের দেবদেবীরা গভীর রাত্রে সরোবরে এসে স্নান করে, যার প্রতিফলন হয় আকাশ থেকে গ্রহ বা নক্ষত্র সরোবরে এসে পড়ার মাধ্যমে।

দারচেন থেকে হোড় শহর ছাড়িয়ে সরোবরের উত্তর থেকে দক্ষিণে ৭৫ কিমি. দূরে কুণ্ড (৪৭০৫মি., ১৫৪৩২ ফুট)। একদিকে সরোবর অন্যদিকে ধূ ধূ রুক্ষ প্রান্তর আর শ্বেতশুভ্র শৃঙ্গরাজি, পিছনে অবশ্যই কৈলাস পর্বত। মানসের তীরে একটি গুম্ফা ও আমাদের আগামী তিনদিনের আবাস অতিথিশালা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের আবাস থেকে ১০০মি. মধ্যেই মানসের জল। পাড়ের কাছেই নুড়ি পাথর ও লম্বা ঘাস জাতীয় জলজ উদ্ভিদ। জোড়ায় জোড়ায় বিশালাকৃতি সোনালী রংয়ের সারস, লম্বা গলাটা কালো রংয়ের। মানসের নীল জলে জলকেলিতে ব্যস্ত। সরোবরের পাড়ে ও উপরে নানা প্রজাতির ও রংয়ের পাখীর আনাগোনা। জলের মধ্যে ছোট ছোট ঢেউ আছে যা পাড়ে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান জলের ঘন নীল আবরণ, আকাশের প্রতিবিম্ব যা পরিবর্তনশীল।

মাথার উপরে সূর্যদেব যদিও অকৃপণ হয়ে অনর্গল তার কিরণরাশি বিকিরণ করছে, আমরা প্রচণ্ড ঠান্ডা অনুভব করছি। সরোবরে ডুব দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। জলে পা রাখতেই মনে হল বিদ্যুতের শক লাগলো। লাফিয়ে জল ছেড়ে উঠে এলাম। সবার প্রায় একই অবস্থা। এর পরে, ধীরে ধীরে জল সইয়ে ঠান্ডার কামড় অগ্রাহ্য করে কোমর জলে নেমে তিনবার ডুব দিয়ে উঠলাম। তীরে প্রচন্ড জোরে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া। ঈশ্বরের কী অপার মহিমা। ঠান্ডা আর লাগছে না। জলের ভিতর এক দল মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। প্রথম রাত্রি মানসের তীরে কাঁচের জানালা দিয়ে জলের বর্ণের পরিবর্তন ও আলোর প্রতিফলন দেখে কেটে গেল।

আমাদের দ্বিতীয় দিনের লক্ষ্য ছিল মানসের তীর আবর্জনা মুক্ত করা। এই লক্ষ্যে গুম্ফা থেকে চারটি ট্রলি নিয়ে ১ কিমি. বেশি সরোবরের পাড় পরিস্কার হলো। এর পরে সরোবরে ডুব দিয়ে আবাসে ফিরে গেলাম। তৃতীয় দিন সকালে ডুব দিয়ে নির্ধারিত মঞ্চে হবন বা যজ্ঞের প্রস্তুতির সামিল হলাম। যজ্ঞের প্রসাদের মাধ্যমে দুপুরের ভোজন হল।

আজই আমদের শেষ রজনী। এত সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশ ছেড়ে যেতে বিষাদে সবার মনই ভারাক্রান্ত। আবার মাসখানেক ধরে বাড়ীর বাইরে থাকার জন্য হোম সিকনেস আছে। পরের দিন সকালে মানস ও কৈলাসকে বিদায় জানিয়ে ১৮২ কিমি. দূরের টাকলোকোট, এখানে দু'রাত কাটিয়ে, লিপুলেখ পাস হয়ে, আগের থেকে দুদিন কম সময় নিয়ে (৪ দিন) ধারচুলা ফিরে এলাম। ধারচুলা থেকে বাসে করে পিথোরগড় ও জাগেশ্বর হয়ে দু'দিনে (২রা জুলাই) দিল্লি। এই ভ্রমণের সময়কাল ছিল ২৭ দিন, ভারতীয় ভূখণ্ডে ১০ দিনে ১৮৬ কিমি. ও চীনা ভূখণ্ডে ৩ দিনে ৪৮ কিমি.।

আপাতদৃষ্টিতে দুর্গম হলেও, শারীরিক সক্ষমতার থেকে ইচ্ছাশক্তি এই যাত্রার মূলমন্ত্র এবং সার্থক করতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। অজানা প্রাকৃতিক সম্ভার, পাহাড়ের পরিবর্তনশীল রং ও গঠন আর তুষারশোভিত পর্বতের শিখরে চলা এ পথের পাথেয়। আলোকের ঝর্ণাধারায় মনের সব আবর্জনা দূর হয়ে অপার আনন্দের অনুভূতি হয়।

২৭ দিনের আমার এই ভ্রমণ প্রকৃত অর্থে আত্মোপলব্ধির, আত্মশুদ্ধির এবং আলোর দিশা। আমার সঞ্চয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অপূর্ব মুগ্ধতা এবং অপার শান্তি।

ওঁ নমঃ শিবায়

কেন যাব না?

ছন্দা দত্ত

ছাব্বিশে এপ্রিল বেরিয়ে পৌঁছলাম ২৭শে। আমরা এবার মিরিক, কালিম্পং, লাভা, রিশপ ইত্যাদি পাঁচ ছ'টা জায়গা যাব বলে বেরেয়েছি। হোটেল বুক করাই ছিল। নেপালের ভূমিকম্পের জন্য আমার একটু ভয় ছিল। যাই হোক, কলকাতা থেকে বেরিয়ে মিরিকে পৌঁছে বেশ একটা সুখানুভূতি হচ্ছিল, সেটা মনোরম আবহাওয়া ও দৃশ্যপটের জন্য। মনটা দিব্যি ফুরফুরে। অস্থায়ী আবাসের নাম 'জয়জিৎ হোটেল' — আমাদের ঘর বেসমেন্টে। ছোট্ট শহর — স্থানীয় মানুষজন, বাড়ী, বাগান, ট্যুরিস্টদের দল নিয়ে বেশ একটা সুখী সুখী পরিবেশ। নরম রোদ, রঙীন ফুল, নানারকম পোষাক, নানা ভাষা — খুব চমৎকার আবহ।

দুপুরের খাওয়া কৃষ্ণনগরের একটা হোটেলে, না নদীয়ার কৃষ্ণনগর নয় কিন্তু, এখানে একটা স্থানীয় জায়গার নাম কৃষ্ণনগর। খাওয়া হয়ে গেলে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের কোন ইচ্ছাই নেই। ধারে কাছে ঘুরঘুর — লেক, পার্ক, বাগান। লেকের ধারে বিশাল ঝাঁক বেঁধে আসা মাছেদের খাবার দেওয়া। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফলের রস খাওয়া, একটু পরেই চা — কিছু বাদ দেওয়া নেই। রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে কার কিসে শরীর খারাপ, কি খেলে অম্বল, কি খেলে হজমের অসুবিধে এ নিয়ে আমরা ভাবি না কারণ তখন তো আমরা অনেক কমবয়সী হয়ে যাই। সন্ধ্যে হয়ে এল — ধীরে ধীরে হোটেলে ফেরা। এবারে স্নান সেরে ক্লান্তি দূর করতে হবে। ঢুকলাম স্নান ঘরে — মনে আনন্দের রোশনী। ভাবছি — এই তো সবে শুরু — আরও কত জায়গায় যাওয়া। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, লাভা ইত্যাদি — কত জায়গা বাকী। চানঘরে গলায় গান। হঠাৎ যেন ভুতে মারল ঠেলা। পায়ের তলায় মেঝে থরথর করে কাঁপছে, ঝপ করে আলো নিভে ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। শুধু হোটেলের যাত্রীরাই নয়, মনে হল গোটা শহরটা আর্ত চিৎকার করছে। মুহূর্তে নেপালের ছবি ভেসে উঠল। মুখে চোখে সাবান, ভীত আমি দরজা খুঁজে পাচ্ছি না, গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল। দরজার বাইরে থেকে ভরসা গলা — ভয় নেই — ধীরে সুস্থে দেখ — ছিটকিনি পেয়ে যাবে, আস্তে আস্তে বেরোও। বাইরের ভয়ার্ত চিৎকার, কান্না, ধুপধাপ, দুদ্দাড় আওয়াজ শুনতে শুনতে আমার অবস্থা ক্রমশ খারাপ। অবশেষে দরজা খুলে বেরতে পারলাম। খুব ক্ষণিকের ধাক্কা কিন্তু তার রেশ বেশ অনেকখানি। সঙ্গী দুজনের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে অন্ধকার পেরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় উঠলাম। প্রচুর লোক রাস্তায়, সবাই আতঙ্কিত। সবাই সমস্বরে স্বীয় অনুভূতির বর্ণনায় ব্যস্ত। ছোট্ট শহরের সব লোকজন এবং হোটেলের সব যাত্রীরা রাস্তায় — কারুর হাতে টর্চ তো কারও কাছে মোবাইলের আলো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভূমিকম্পের ভূত শহরটার ঘেঁটি ধরে টান মেরেছে। এইভাবে ভূমিকম্পের প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলানো গেল।

আজন্ম কলকাতাবাসী আমার ভূমিকম্পের কোন অভিজ্ঞতা নেই। ভূমিকম্প মানে টিভি ও খবরের কাগজের খবর ও ছবি। বড়জোর সিলিং ফ্যানের ও আলোর শেডের দুলুনি। সত্তর বছর পার করে এসে বুঝলাম ভূমিকম্প কি জিনিস! চারিদিকের খবরে জানা গেল মিরিকই হচ্ছে এই কম্পনের উৎস। মিডিয়ার দৌলতে কলকাতায় তখনই খবর পৌঁছে গেল। এমনিতেই আমার অভিভাবকদের (পুত্ররা ও পুত্রবধূরা) মনঃপুত ছিল না নেপালের ওই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর আমরা মিরিক বা দার্জিলিং-এর দিকে যাই। আমরা অভিভাবকদের কথা মানিনি (এক সময় তো ওরাও এটা করত তার — বেলা?) নিজেদের মত বেরিয়ে পড়েছি। এ যেন যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। অতঃপর ফোন আসা শুরু। কলকাতা থেকে ছেলেদের, আত্মীয়, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ — আর এগিয়ো না। শিলিগুড়িতে নেমে যাও — বরং ডুয়ার্সটা ঘুরে নাও ইত্যাদি। তিনজনের ফোন আর বন্ধই হয় না। ভয় ভীতি থিতিয়ে গেল, চারপাশ অপেক্ষাকৃত শান্ত। আমাদের রাত দেড়টা পর্যন্ত নিজস্ব আলোচনা কি করবো বা এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। শান্তিপ্রিয় ভিতু মানুষ আমি — চাইলাম নেমে যেতে। জরুরি বৈঠকের ফলশ্রুতি — চরৈঃবেতি। আমি বাদে বাকী দুজন বললেন সবাই-ই যখন নেমে যাচ্ছে চলো আমরা বরং ওপরে উঠি।

বেরোলাম আমরা ভোরবেলা। মটরস্ট্যান্ড বাসস্ট্যান্ড সর্বত্র ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি, কে কত বেশী পয়সা দিয়ে আগেভাগে শিলিগুড়িতে নেমে যাবে। দর কষাকষি গাড়িওয়ালা ও সওয়ারীর মধ্যে। মনে হচ্ছে সমতল শিলিগুড়ি যেন ভূমিকম্পজনিত বিপদসীমার বাইরে।

মিরিকের হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি ওপরে যাওয়ার লোকজন বা গাড়ি প্রায় নেই। সবাই নিম্নমুখী শুধু আমরা তিন বুড়োবুড়ি ঊর্ধমুখী। দার্জিলিং-এ আগে ভূমিকম্প হয়েছিল, এবারে মিরিকের খবর পৌঁছলে সে শহরেও ট্যুরিস্টের হুড়োহুড়ি নিচে নামার জন্য। তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছিল, একটা ধাক্কাধাক্কিও ছিল কারণ শহরের এদিক ওদিক নানান সোপান শ্রেণী। একটা জিনিস লক্ষ্য করে একটু অবাক হচ্ছিলাম। যারা নিচে নামছিলেন তাঁরা আমাদের ওপরে ওঠা দেখে তাজ্জব মুখভঙ্গি করছিলেন। ব্যাপারটা যেন একি আজব লোক। এই বয়সে লোকে ঘর থেকে বেরোয় না আর এরা স্রোতের বিপরীতে গা ভাসিয়ে চলেছে কোথায়? যেচে এসে আলাপ পরিচয় হওয়ার পর কেউ কেউ শ্রদ্ধার চোখে তাকিয়েছেন, কেউবা ভালবেসে বলেছেন — চলুন না ফিরেই যাই, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে আবার উর্ধ্বমুখী। চলেছি খুব আরামে। কোন ভিড় নেই, গাড়িভাড়াও কম। ছিপছিপে বৃষ্টি মাথায় পৌঁছলাম দার্জিলিং। একটু ঘুরতেই খুব অল্প ভাড়ায় ম্যালের ওপর হোটেল মিলে গেল। আরামপ্রদ বাসস্থান। আনন্দ করে কদিনে বাকী গন্তব্যস্থল ঘুরে নিলাম। বাজেটের চেয়ে অনেক কমে। টাকা পয়সা ফেরত নিতে আমরা অনিচ্ছুক তাই উদ্বৃত্ত পয়সা দিয়ে ছোট্ট করে দিন তিনেক পেলিংও ঘুরে নিলাম। ভাবলাম, ভাগ্যিস সহযাত্রীদের সঙ্গে তর্কে হেরেছিলাম।

প্রসঙ্গ ভ্রমন

বাঙালীদের মধ্যে প্রথম সার্থক ভারত পর্যটক সম্ভবত চৈতন্যদেব। বস্তুত তাঁর ভ্রমন বিবরন দিয়েই বাংলা সাহিত্যে আসচেতন ভ্রমন সাহিত্যের উদ্ভব – একথা বলা সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না। তবে সবচেয়ে সচেতন বাংলা ভ্রমনকাহিনীটি সম্ভবত বিজয়রাম সেন রচিত 'তীর্থমঙ্গল', কবি বিজয়রাম সেন, রাজসদৃশ ধনী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের ভ্রমনের সঙ্গী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ভ্রমনকালে তিনি যে বিবরন কাব্যাকারে লিখে রেখেছিলেন তা সম্পূর্ন হয় ১১৭৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে – আজ থেকে প্রায় ২৩৫ বছর আগে। এর আগেই তারা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন নৌকাযোগে। বিজয়রাম পুঁথির আকারে যে ভ্রমন বিবরন লিখে রাখেন সেটি সম্পাদনাপূর্বক প্রাচ্য বিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বাবু ইংরাজী ১৯১৫ সনে অর্থাৎ ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেন। তারপর থেকে এটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে।

রূপময় হিমালয়ের টানে

হরিসাধন দে অধিকারী

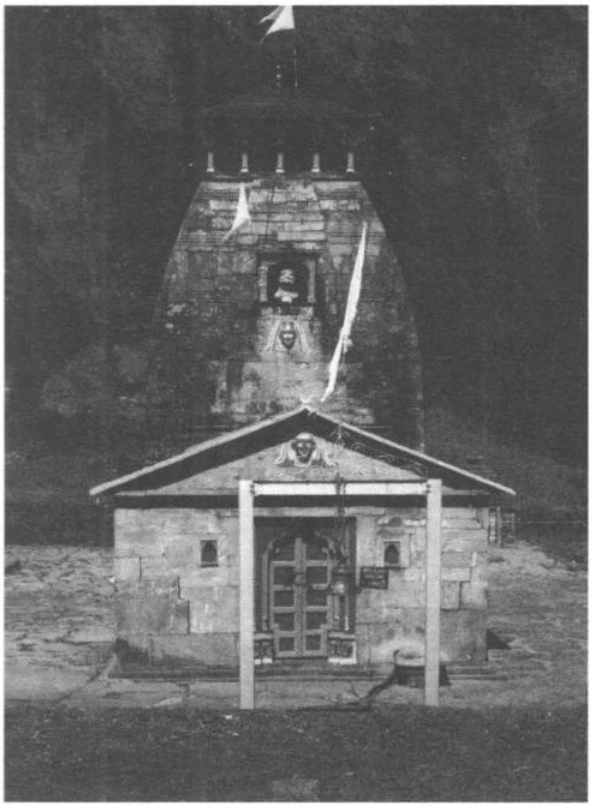

মদমহেশ্বর মন্দির ছবি - লেখক

হিমালয়কে নিয়ে কত লেখা, কত কাহিনী — কত তার রূপ মাধুর্যের বর্ণনা! তার ভয়াবহতা, তার বিশালতা — সে সবকিছুই মনকে করে তোলে মোহাবিষ্ট। প্রতি পরতে নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে আবির্ভূত হয় এক এক জনের লেখনীতে। হিমালয়ের সৌন্দর্যের দুর্বার টান অস্বীকার করে এমন মানুষ দুর্লভ। তাই তো ঘর ছেড়ে শতকষ্ট সহ্য করেও মানুষ ছুটে যায় হিমালয়ের পথে পথে।

না, কোন অভিযান নয়। হিমালয়ের এক অপরূপ শৈবতীর্থ ভ্রমণ কথা নিয়ে আমার এই আখ্যানের অবতারণা। শুধু চোখে নয়, অন্তরের উপলব্ধিতে নয়, সারা অঙ্গে বুলিয়ে নিতে চেয়েছি এর সুবাস। আমার কাছে এই পথ চলাতেই জীবন পায় ছন্দ, হয়ে ওঠে গতিময়।

ছাত্রজীবনে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভূক্ত শিক্ষামূলক ভ্রমণ দিয়েই পথে নামা। সে ভ্রমণ ছিল মূলতঃ সমুদ্রকে কেন্দ্র করে। মাত্র ২৪-২৫ বছর বয়সে ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত সমুদ্র সৈকতই আমার ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে সময়ের ভরা যৌবন আর সমুদ্রের উচ্ছলতা মিলেমিশে এক হয়ে মনকে করেছিল উদ্বেলিত। ঢেউ-এর পর ঢেউ আছড়ে পড়েছে তটে — মুহূর্তে মিলিয়ে গেছে দুধসাদা ফেনারাশি, মনে-প্রাণে লেগেছে দোলা। হিমালয় প্রেমী বন্ধুদের হিমালয় ভ্রমণের আবেদন সমুদ্রের সেই চঞ্চলতা এক পলকে ভাসিয়ে দিয়েছে। আর আজ?

সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা। এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর ছুটিতে গিয়েছিলাম হরিদ্বারে। সন্ধ্যায় হর-কি-পৌরির ঘাটে গঙ্গারতি দেখছি। হঠাৎ বন্ধুর প্রস্তাব — "কেদার-বদ্রী যাবি?" সত্যিই, সেদিন কোন প্রস্তুতি ছাড়াই পরদিন সকালের বাসে রওনা দিলাম কেদার-বদ্রীর পথে। সেই প্রথম হিমালয়কে দেখা — সে কি উত্তেজনা। বদ্রীতে বরফের উপর ছুটোছুটি — ঘন সবুজ জল-জঙ্গল পেরিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে কেদারনাথ দর্শন — আজও কেমন যেন স্বপ্ন বলে ভুল হয়। চোখ বন্ধ করলেই শুনতে পাই একটানা ঝিল্লীর ডাক, বনভূমি মুখর করা পাখির কলতান, স্নিগ্ধ বাতাসে বয়ে চলা ঝরাপাতার মর্মর ধ্বনি। চোখের পাতায় ছবি আঁকে নাম না জানা ফুলের রঙ, ঘাস-লতা পাতায় ঢাকা মখমলী বুগিয়াল। অন্যদিকে পথের ধারে কতশত ঝর্ণাধারা; মন্দাকিনী-অলকানন্দার অবিরাম চঞ্চল গতিতে উপলখন্ড ধুয়ে বয়ে চলা মনে আনে এক প্রশান্তি।

বয়স হচ্ছে - শারীরিক ক্ষমতা কমছে। কিন্তু এখনও আমি এক বিমূঢ় হিমালয় দর্শক — তথা প্রেমী। হিমালয়ের স্তরে স্তরে দৈবসত্তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছি, বাস্তবতা ডিঙিয়ে অস্তিত্বের উর্দ্ধে উঠতে চেয়েছি। হিমালয়কে ছুঁয়ে দেখার বাসনা আজও আমার মনে প্রাণে শিহরণ জাগায়।

অনেক দিন হ'ল। ২০০৫ সালে গিয়েছিলাম গাড়োয়াল হিমালয়ের মদমহেশ্বর — পঞ্চকেদারের দ্বিতীয় কেদার। এ পুণ্যভূমিকে নিয়ে মহাভারতের কত কথা — সে তো সকলের জানা। হাওড়া থেকে দিল্লী হয়ে হরিদ্বার। সেখান থেকে গাড়ী পথে উখিমঠ। বেশি রাতে পৌঁছে সেখানে ভারত সেবাশ্রম সংঘেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। পরদিন সকাল হতেই চোখে

পড়ল নীল আকাশ জুড়ে তুষারাবৃত চৌখাম্বা পর্বতশৃঙ্গের গর্বিত উপস্থিতি। আরো কত শৃঙ্গ। সে রূপ বর্ণনার ভাষা আমার নেই। সম্বিত ফিরল সঙ্গীদের তাড়ায়। এই পরিণত বয়সেও এ প্রেমসুধা সাগরে নিমজ্জিত হবার নেশায় মগ্ন হয়ে যাই। শুধু আমি কেন? যে একবার এ পথের স্বাদ পেয়েছে, তার বোধ করি এ দশাই হয়।

এই উখিমঠ থেকে রাস্তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে গাড়িতে আমাদের যাত্রা শুরু হল। মনসুনা হয়ে লেঙ্কা পৌঁছাই দুপুর নাগাদ। এখান থেকেই গাইড ভাই ও মালবাহী তিন ঘোড়া নিয়ে পায়ে হাঁটা শুরু। দুদিনে প্রায় ২১ কিমি. হাঁটা পথ। প্রথম দিনের গন্তব্য রাঁশি। বেশ বড় পাহাড়ী গ্রাম। ডানদিকে অনেক নীচে বয়ে যাওয়া মদমহেশ্বর গঙ্গাকে সঙ্গী করে ছায়া বিছানো পথ বেয়েই চলে এলাম উনিয়ানা। পথে গ্রাম্য শিশুদের আব্দার — 'টফি দো বাবু।' সেই সামান্য টফি পেয়ে তাদের কি আনন্দ! আনন্দোজ্জ্বল হাসিমুখগুলো পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল। দেখতে দেখতে পথের শোভাকে সঙ্গী করে রাঁশি গ্রামেও পৌঁছে গেলাম। আজকের মত যাত্রা শেষ — বিশ্রাম। পরবর্তীকালে অবশ্য রাঁশি পর্যন্ত গাড়ী রাস্তা হয়েছে। তাতে শারীরিক কষ্ট কমেছে তবে প্রকৃতির স্বাদ নিয়ে হাঁটা — তার আনন্দই আলাদা। ছোট্ট 'হোম স্টে' লাগোয়া এক চিলতে বারান্দা। ব্যাগপত্তর রেখে বারান্দায় বসলাম হাত-পা ছেড়ে। নীচে মহদমহেশ্বর গঙ্গার স্রোত, পাহাড়ি গাছের মাথার ফাঁক-ফোকর দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের আলো সভ্যতার চিহ্নলেশহীন পার্বত্য প্রকৃতির কোলে এক অদ্ভুত আবেশ সৃষ্টি করল। খানিক বাদেই গৃহকর্ত্রী গরম ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ সাজিয়ে হাজির — সোনায় সোহাগা। দেহমন একটু তাতিয়েই বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম দেখতে। খানিক দূরেই কাঠের গায়ে সুন্দর কারুকার্যখচিত রাকেশ্বরী মন্দির। এর নামেই রাঁশি গ্রামের নামকরণ। ঘুরতে ঘুরতে টুপ করে একটা সুন্দর ছবি ভরে ফেললাম মন-ঝুলিতে। হঠাৎ কানে এল ব্যান্ড পার্টির আওয়াজ। হুটোপুটি করে হাজির হয়ে গেল কচি-কাঁচা-বুড়ো-ছুঁড়োর দল। দেখি সুসজ্জিত এক দোলায় চেপে আসছে 'বর-বৌ'। যাচ্ছে পাশের গ্রামে — শ্বশুরবাড়ি। ছোট্ট একরত্তি বৌ। তার সে কি কান্না! অজানা-অচেনা ছোট্ট মেয়েটা মুহূর্তে সকলের মন ভিজিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

পরদিন সকাল সকাল নরম রোদে গা ভিজিয়ে পরের গন্তব্য গোন্ডার হয়ে নানুর দিকে পা বাড়ালাম। সেই ওক-পাইন ছাওয়া পথ। মাঝে মধ্যেই অজস্র লাল-গোলাপী-সাদা রডোডেনড্রনের পাগল করা রূপ। এ পথে হাঁটতেও বেশ মজা — উৎরাই পথ। চোখ আর পা দুই-ই পরম আনন্দে নিয়ে গেল অনেক দূর। ধীরে ধীরে পথ আবার কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল। হাঁফ ধরছে

চৌখাম্বা ছবি - লেখক

বুকে, টান ধরছে পায়ের পেশীতে। তবে দৃশ্য মনোরম। গ্রাম্য মহিলাদের কর্মব্যস্ততা, দূর গ্রামে স্কুলে পড়তে যাওয়া ছেলেমেয়েদের দল, সিঁদুর রাঙা রামদানার খেত — দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। হঠাৎ চোখে পড়ল এক মজার Technology. পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা বেগবতী ঝর্ণার জল দিয়ে চালানো হচ্ছে গম ভাঙানো কলের মোটর। বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী দূষণমুক্ত কারিগরি। সেদিনের মতো পৌঁছে গেলাম নানু গ্রামে। আজ সেখানেই বিশ্রাম।

বেশ সকালেই ঘুম ভাঙলো, ভোরের কুয়াশার চাদর সরিয়ে রূপোর মত ঝকঝকে চঞ্চল রোদ পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছানোর আনন্দ নিয়ে পথে নেমে পড়লাম। আজ শুরুতেই পাথুরে চড়াই — চলতে বেশ কষ্ট। পাথরের খাঁজে মাঝেমধ্যেই চোখ পড়ল বেশ বড়সর গিরগিটি। সচেতনতা বেড়েছে এদেরও। ঘাড় উঁচু করে মানুষজন দেখেই পগার পার। অনেক কসরত করে তাকে ক্যামেরাবন্দী করা গেল। চলতি পথের ডানদিকে সারিবদ্ধ তুষারশৃঙ্গ। সূর্যদেব পৌঁছে গেছেন প্রায় মধ্য গগনে। উজ্জ্বল আলোয় দূর পর্বতের শ্বেতশুভ্র রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রোদের বিচ্ছুরণে বরফ পাহাড় চোখ ঝলসে দেয়। বোল্ডারের চড়াই ভেঙে চলেছি। গতি ক্রমশঃ কমছে। এক সময় সঙ্গী গাইড ভাই দূরে আঙুল তুলে ১১৪৭৪ ফুট উঁচু মদমহেশ্বর মন্দিরের চূড়া নির্দেশ করল। মুহূর্তেই শরীর মনে এক অপার শক্তির সঞ্চার হল। সম্মিলিত কণ্ঠে গগন বিদারী ধ্বনি উচ্চারিত হল — "জয় বাবা মদমহেশ্বরের জয়।" লক্ষ্যে পৌঁছানোর আনন্দে নিজের অজান্তেই দুচোখের কোণ জলে ভরে উঠলো। আবেগে সবাই আপ্লুত। আমার আত্মা-সত্ত্বায় অনুভব করি এক অনাবিল আনন্দ। পায়ে পায়ে চলে এলাম শিবঠাকুরের আপন দেশে। মদমহেশ্বর উপত্যকায় চৌখাম্বার পাদদেশে স্বমহিমায় বিরাজ করছে মন্দির চত্বর। মদমহেশ্বর মন্দিরের

গঠনশৈলীতে কেদারনাথ ও তুঙ্গনাথ মন্দিরের অনেকটা মিল আছে। উত্তর-পূর্বদিকে ছোট্ট দুটি মন্দিরকে সঙ্গী করে মূল মন্দিরের অবস্থান, ঐ ছোট্ট দুটি মন্দিরের একটিতে নিকষ কালো পাথরের পার্বতী ও অন্যটিতে হরপার্বতীর যুগল মূর্তি। বিশ্বাস এই মদমহেশ্বরেই পূজিত হয় মহাদেবের নাভিদেশ। তাই তো নাম হয়েছে মধ্যমহেশ্বর বা মদমহেশ্বর। শান্ত অনাড়ম্বর অপরূপ পরিবেশ। সামনেই মখমলী বুগিয়াল। অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিলাম নরম ঘাসের আদর মাখা কোলে। মন-প্রাণের উষ্ণ আর্তি হিমেল বাতাসে বইয়ে দিলাম পরম ঈশ্বরের উদ্দেশে।

দলনেতা তাঁর দায়িত্ব পালন করে পাশেই মন্দির কমিটির তিনটে ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে ফেললেন। ঘাসের ওপর থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে শেষ বেলার আলো। আকাশে লাল আবিরের ছোঁয়া লাগছে। তারই রঙে চোখে পড়ল ঘাসের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা বরফ কুচি। শুনলাম গত কয়েকদিনের তুষারপাতের কথা। দেখতে দেখতে চারিদিকের সবুজ চারণভূমি নিশ্চুপ হয়ে এল। ঝিম্‌ঝিম্ নিস্তব্ধতায় হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে হিমেল বাতাস। রাত নামছে আকাশ জুড়ে। মন্দিরে বেজে উঠল আরতি ঘন্টা। মন্দিরের আলোকজ্জ্বল সন্ধ্যারতি স্বর্গের দেবপুরীতে নিয়ে গেল। রাত বাড়ার সাথে সাথে নিকষ অন্ধকার যেন গ্রাস করল পৃথিবী — শান্ত নিশ্চুপ পৃথিবী। হাড় হিম করা রাত কাটল।

ভোরের আলো ফুটল। শত সহস্র হীরের টুকরোর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল মন্দির সম্মুখের বুগিয়ালে। শিশির কণার উপর ভোর সূর্যের আলো সত্যিই উজ্জ্বলতায় হীরের সমান। আমরা মন্দিরের ডানদিকে সামান্য সমতল পেরিয়েই বুড়া মদমহেশ্বরের পথে পা বাড়ালাম। এখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উপরের দিকে হাঁটা। খানিক এগিয়েই ঠাহর হল আসলে পথ বলে কিছুই নেই। বড় বড় পাথরের চাঁই ধরে ধরে ক্রমশঃ উঠে চলা। এক একটা স্তরের পরেই যেন মনে হচ্ছে পৌঁছে গেলাম, কিন্তু আবার পাহাড়ের মাথা জেগে উঠছে। অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে হাঁটছি। বিপদে পড়লাম মাঝপথে। জ্বরে আর কষ্ট সহ্য করতে পারছে না মেয়ে আমার। ক'দিন থেকেই শরীর ভাল নেই। তবু শুধুমাত্র দেখার আনন্দেই হেঁটে চলেছে সমান তালে। সেই অসুস্থ মেয়েকে পাহাড়ের ঢালে পাথরের উপর একলা বসিয়ে রেখেই আমরা এগিয়ে চললাম। আজ অজানা অচেনা পথে বিপদের কথা কল্পনা করে সর্বশরীর শিউরে ওঠে। কিন্তু সেদিন নেশাগ্রস্ত আমি তুষারাবৃত চৌখাম্বার আকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে পারিনি। অবশেষে পৌঁছিয়েছি চৌখাম্বার পদতলে। বেশ সমতল বুগিয়াল। তিনদিকে চৌকো আলগা পাথর সাজিয়ে তৈরী ছোট্ট বুড়া মদমহেশ্বর মন্দির, মাঝখানে শিবলিঙ্গ — বৃদ্ধ মদমহেশ্বর জ্ঞানে যার পুজো হয়। সামনেই অগভীর স্বচ্ছ তাল। আর তাতেই চৌখাম্বার প্রতিফলন — অসাধারণ! জল স্পর্শ করলেই যেন চৌখাম্বার বরফ সাদা চূড়া স্পর্শ হবে। প্রখর সূর্যকিরণে শ্বেতশুভ্র চৌখাম্বার ঝলমলে রূপে মুগ্ধ হলাম আমরা। জলাশয়কে সম্মুখে রেখে আমরা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে। সৌন্দর্যের বিমুগ্ধতা নিমেষে অবশ করল মন। অপরূপ ভালোলাগায় হৃদয়ের জমে থাকা বরফ স্তর গলে চোখের নরম পাতা বেয়ে কয়েক ফোঁটা যেন গড়িয়ে পড়তে চায়।

এরপর ধীরে ধীরে ফেরার পালা। অল্প সময়ের মধ্যেই পথে বসিয়ে যাওয়া মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মদমহেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে নেমে এলাম। চট্‌জলদি স্নান সেরে মন্দির প্রদক্ষিণ করে সঙ্গীদের পুজো দেবার পালা। তারপর ঝুপড়ি হোটেলে দুপুরের খাওয়া সেরে পুণ্যভূমি ছেড়ে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামা। মনে এক আবেশ — সকলেই পথ চলছে, কারো মুখে কথা নেই। শুধু হাঁটা আর হাঁটা। মনে একটা আক্ষেপ নিয়ে ফিরে এলাম। এমন রূপ আমার আদরের মেয়ে দেখতে পেল না। ওর কথা ভেবে আজও কষ্ট হয়।

বুড়া মদমহেশ্বর ছবি - লেখক

উপেক্ষিত

স্বাতি নন্দী

কর্ণাটক বেড়ানোর কথা বললেই যে নামগুলো সারি বেঁধে এসে দাঁড়ায় তারা হল হাম্পি, হ্যালোবিদ, বেলুর, শ্রবণ বেলগোলা। কেন জানি না চিকমাগালুর নামটা এদের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারে না। কিন্তু চিকমাগালুর শহরটি নিজে সুন্দর, শুধু সে নয়, তার সৌন্দর্য ছড়িয়ে রেখেছে আশেপাশে। যার মধ্যে অন্যতম বাবাবুদান, গ্যালিকেরে, গদাতীর্থ, কুদ্রেমুখ, কেম্মানগুড়ি।

চিকমাগালুর শব্দটি কন্নড় ভাষায় 'সিকমাগালাউরু' থেকে এসেছে। যার অর্থ 'কনিষ্ঠ মেয়ের শহর'। কথিত আছে রাজা রুকমানগাড় এই শহরটি কনিষ্ঠা কন্যাকে পণ হিসাবে দিয়েছিলেন।

কর্ণাটকের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অবস্থিত চিকমাগালুর ১৭৩ নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এই জেলা শহরটি ব্যাঙ্গালোর থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে। সুন্দর সাজানো গোছানো ছোট্ট শহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সুন্দর আবহাওয়া তার আকর্ষণের অন্যতম কারণ। শীতের তীব্রতা এবং গ্রীষ্মর প্রচন্ডতা নেই। কর্ণাটকের সর্বোচ্চ পাহাড় মুল্লাইয়ানগিরি চিকমাগালুর থেকে মাত্র বারো কিলোমিটার দূরে। মনে হবে যেন মুল্লাইয়ানগিরি তার শহরটিকে পরম যত্নে আগলে রেখেছে। মুল্লাইয়ানগিরি থেকে সূর্যের বাড়ি ফেরার দৃশ্য মন ভরিয়ে দেবে।

কফির সুবাসে আকৃষ্ট করে না এমন মানুষকে বোধ হয় বর্তমানে খুঁজে বের করতে হয়। তাই কফি পিয়াসী জনগণের তীর্থক্ষেত্র হওয়া উচিত যে বাবাবুদান পাহাড়, তার অবস্থান চিকমাগালুর শহর থেকে মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। ১৮৯৫ মিটার উচ্চ বাবাবুদান, হিমালয় ও নীলগিরির মাঝের অন্যতম উচ্চ এক পর্বতশৃঙ্গ। শিশুচন্দ্রের (cresent moon) মতো আকৃতির এই পাহাড়ের জন্মনাম কিন্তু চন্দ্রদ্রোণ পর্বত। কেন তার নাম পাল্‌টে বাবাবুদান হলো সেই কাহিনীতেই জড়িয়ে রয়েছে কফিপ্রেমীদের তীর্থক্ষেত্র হবার কারণ। ষোড়শ শতক মতান্তরে সপ্তদশ শতকে কর্ণাটকের এক সাধক বাবা বুদান হজ করতে গেছিলেন মক্কায়। সেই সময়ে কফির একচেটিয়া ব্যবসা ছিল ইয়েমেনের। পৃথিবীর নানাপ্রান্তে তৈরী (roasted & baked) কফিই সরবরাহ করতো ইয়েমেন। উদ্দেশ্য ছিল ইয়েমেন ছাড়া অন্য কোথাও যাতে কফি চাষ না হতে পারে। এহেন অবস্থায় হজযাত্রী বাবা বুদান কফির আশ্চর্য জাদুতে নিমজ্জিত হলেন। সেই মুগ্ধতার স্পর্শ দেশবাসীকে দেবার জন্য সাতটি (সাত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে অতি পবিত্র সংখ্যা) কফিবীজ সন্তর্পণে নিজের পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে ফিরে এলেন। অতঃপর 'কাদুর' জেলায় চন্দ্রদ্রোণ পর্বতের ঢালে তাদের বপন করলেন। সেই বীজ বপনের ফল বহন করে চলেছি আমরা। কৃতজ্ঞতা হিসাবে পাহাড়টিকে দেওয়া হয়েছে সেই সুফি সাধকের নামের সীলমোহর। এখানেই রয়েছে বাবা বুদানের স্মরণতীর্থ। শুধু ইসলাম ধর্মের অনুগামীদের কাছেই নয়, হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছেও এটি সমান পবিত্র স্থান। কোলাহলমুক্ত উদার আকাশতলে এ গুহার অবস্থান। গুহায় ঢোকার মুখের লোহার তার কাঁটায় লাল হলুদ সুতোয় বাঁধা নানা আকারের, নানা মাপের তালাবন্দী মনোবাসনা ঝুলছে। মুক্তি পাক তালা বন্দীদশা থেকে — ভাবলাম সেকথা। মনে পড়ল তিনসুকিয়ায় দেখেছিলাম এক ঘন্টাবাবার মন্দির। সেখানে সবাই ঘন্টা বেঁধে রাখে মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য। এখানে তালার সংখ্যা কম। ঐ মন্দিরে ঘন্টার প্রাচুর্য চোখে পড়ার মতো। দরজায় ঘন্টা, গাছে ঘন্টা, রেলিঙে ঘন্টা, আনাচে কানাচে, আবর্জনা স্তূপে সর্বত্র ছোট বড়, মাঝারি নানা মাপের ঘন্টা। অনায়াসেই ব্যবসা শুরু করা যায় এতই তার পরিমাণ। সংখ্যা যদি মনের ইচ্ছা পূরণের কোন মাপকাঠি হয় তাহলে কম বা বেশি কোন সংখ্যাটাকে ইতিবাচক ধরবো সেটা ভেবে বেকুব হলাম। এখানেই নাকি বাবা বুদান সাধনা করতে করতে মিলিয়ে গেছিলেন। ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে সব ধর্মের সাধকদের বিষয়েই এমন নানা অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে লোহার ঘেরাটোপ পেরিয়ে নতশিরে সেই গুহায়প্রবেশ করলাম। গুহার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা প্রার্থনাধ্বনি শুনতে শুনতে বাবা বুদানের পাদুকা দর্শন করে মনে হচ্ছিল হতেও পারে এ কাহিনী নয়, ঘটনা। "রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা" - সবের কারণ কি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি! চর্মচক্ষে দেখে তো এটাই ঠাহর হচ্ছিল না ঘেঁটি নীচু করে কিছু সময় যেখানে দাঁড়ানো কষ্টসাধ্য সেখানে কোন মানুষ বছরের পর বছর কীভাবে সাধনা করতে পারেন। অন্য দুই সাধকের সমাধিও রয়েছে এখানে। গুহার অন্যদিকে রয়েছে লালমাটির স্তূপ। যেখান থেকে সকলে পবিত্রজ্ঞানে সেই মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। ভারী সুন্দর এক গন্ধ সেই মাটিতে। হয়তো বছরের পর বছর আবদ্ধ স্থানে জ্বালানো ধূপের সুবাস ওখানকার মাটিকে সুগন্ধী করে তুলেছে। এই পার্বত্য অঞ্চলে এশিয়ার বৃহত্তম লৌহ আকরিক সংরক্ষিত রয়েছে। কর্ণাটকের ৯৫% লৌহ আকরিক এখানেই

মেলে, যার মান অতি উচ্চ। আর আছে ম্যাঙ্গানিজ। লোহা আর ম্যাঙ্গানিজের বিক্রিয়ার ফলে এই স্থানে মাটি রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। বারো বছর অন্তর কুরুঞ্জি ফুলে ঢেকে যায় এই পর্বতশৃঙ্গ। শেষবার ফুটেছিল ২০০৬ সালে।

লালমাটির রাস্তা বেয়ে আরো কিছুটা (২ কিমি.) এগোলেই আছে এক সরোবর। এটিও সব ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র। এই জায়গার নাম গ্যালিকেরে। সরোবরে নিজেদের ধুয়ে মুছে নিয়ে ছোট্ট এক গর্তমুখে (দেখতে অনেকটা ইঁট দিয়ে বাঁধানো উনুনের মতো) পুজো দিচ্ছে দেখা গেল। ধর্মীয় অনুভব না আসলেও প্রকৃতির রূপটান মনকে আবিষ্ট করবে। লালমাটির কোলে স্বচ্ছ নীলজলের সরোবর, সর্বোপরি নীরবতার আকর্ষণও কম নয়।

কাছাকাছি আছে তিনটি জলধারা, যেগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে পুরাণ কাহিনী। 'গদাতীর্থ' তৈরী হয়েছিল ভীমের গদার আঘাতে, মাতা কুন্তীর তৃষ্ণা নিবারণার্থে। অন্য দুটি নাল্লিকারি তীর্থ ও কামনাতীর্থ।

বাবাবুদান পাহাড়েই গড়ে উঠেছে শৈলাবাস কেম্মানগুড়ি এটি কে. আর হিলস নামেও পরিচিতি গড়ে উঠেছিল, যখন কৃষ্ণরাজা ওয়াদেয়ার (চতুর্থ) এখানে তাঁর প্রিয় গ্রীষ্মাবাস গড়ে তুলেছিলেন। প্রকৃতির নীরবতার মাঝে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানোর উপযুক্ত স্থান এই কেম্মানগুড়ি। কাল্লাথাগিরি ও হেবে নামে দুই জলপ্রপাত নীরব প্রকৃতির সঙ্গী। তবে জনপ্রিয় পিকনিক স্পট হওয়ায় নীরবতার অবসান ঘটে মাঝেসাঝে।

৯০ কিমি. দূরে অবস্থিত পাহাড়ি শহর কুদ্রেমুখ। এখানে একটি জাতীয় উদ্যান আছে আর আছে লৌহ কারখানা।

আমার ভ্রমণসাথী যখন চিকমাগালুরের কথা বলেছিল তখন মোটেই প্রীত হই নি। মনে হয়েছিল ও সেই রায়বেরেলি ভুল করেছে। ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয় তাঁর সৌন্দর্যে সে আজন্ম মুগ্ধ -কাজেই সেই ভদ্রমহিলার শতবর্ষের সূচনায় বোধ হয় তাঁকে ক্ষমতায় জিতিয়ে আনার জায়গায় যেতে চায়। কেননা ভ্রমণ বিষয়ক বইগুলো কেমন যেন বলতে হয় বলে বলার মতো করে লেখা। বেলুর-ঠেলুর যাবার পথে চিকমাগালুর কাটিয়ে আসলেও আসতে পারেন একরাত। অর্থাৎ কিনা না গেলে কিস্যু যায় আসে না। আমার মতে যায় আসে কেননা চিকমাগালুরকে কেন্দ্র করে আরো অনেকগুলো জায়গায় যাওয়া যায়। কাজেই দুদিন বেলুরের প্রত্যেকটা দেওয়ালের প্রত্যেকটা মূর্তির ব্যাখ্যা শুনে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দেখে চলে আসতে হবে চিকমাগালুর। সেখান থেকে বাবাবুদান যেতেই হবে এবং লিস্টি দেখে (নেট ঘাঁটলেই তালিকা মিলবে) আশেপাশে ঘোরার জন্য তিনদিন মতো হাতে রাখতে হবে। তারপর সোজা চলে যেতে হবে কুর্গ। সে তো আর এক নয়ন মজানো জায়গা। তার গল্প আর একদিন।

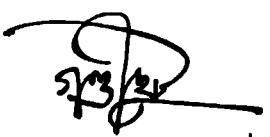

প্রসঙ্গ ভ্রমন

পর্যটন স্পৃহা বিশেষ করে তীর্থ ভ্রমণ ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মজ্জাগত। বিবেকানন্দও ব্যতিক্রমী ছিলেন না। ১৮৮৮ খ্রী. থেকে ১৮৯৩ খ্রী.-এর মে মাস পর্যন্ত স্বামীজীর ভারত পরিব্রাজ্যা কাল। তিনি জীবনের অধিকাংশই কাটিয়েছেন পরিব্রাজনে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ছিল তাঁর অবাধ বিচরন। এছাড়া ইংলন্ড, আমেরিকা, ইউরোপ, লন্ডন, সিংহল, পূর্ববঙ্গ, পারি-তে তিনি পাড়ি দেন। কর্মই জীবন, কর্মেই মুক্তি এই ছিল বিবেকানন্দের শিক্ষা। তাঁর অন্যতম লিখিত গ্রন্থগুলি হল 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'রাজযোগ', 'পরিব্রাজক' ইত্যাদি।

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে

শর্মালী দাস

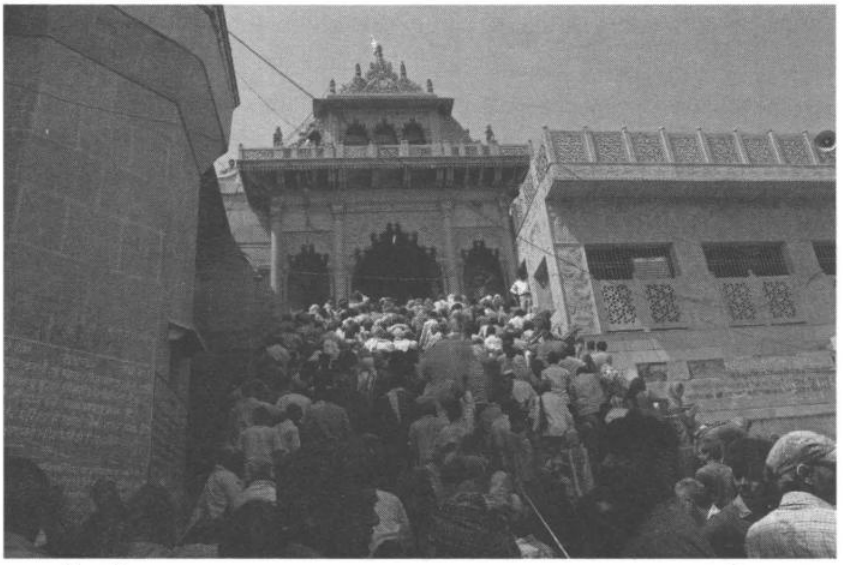

রাধারাণী মন্দির, বারসানা ছবি - লেখক

হোলি বা দোল — যে নামেই ডাকি না কেন — এই উৎসব হ'ল প্রকৃতির রঙ আর মনের রঙের মেলবন্ধনের উৎসব। মাঝ ফাগুনের মন্দ-মধুর হাওয়ার দোলায় মনও দোদুল্যমান। কোকিলের কুহুরবে, গাছে গাছে কচি সবুজ নবপল্লবদলের হিন্দোলে, শিমুল-পলাশ-কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার লাল হলুদ রঙের ছয়লাপে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়। ফাগ উৎসবের সূচনা হয়।

লাঠমার হোলি। ব্রজধামের দোল। ভারতবর্ষে যত জায়গায় দোল হয় তার মধ্যে সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় এবং পৌরাণিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তরপ্রদেশের মথুরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবনে বড় হওয়া। বারসানা এবং নন্দগাঁও — মথুরার সন্নিকটবর্তী দুটি জায়গা। একাদিক্রমে রাধারাণী-গোপীদের এবং শ্রীকৃষ্ণ-গোপদের গ্রাম। মূল হোলির সাতদিন আগে এখানে দোল শুরু হয়।

কিংবদন্তী এই যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজের কালো রঙ আর রাধার উজ্জ্বল রঙের তুলনা করে ঈর্ষান্বিত হয়ে মা যশোদাকে বিরক্ত করত। মার উপদেশানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ ও তার বন্ধুরা (গোপবৃন্দ) নন্দগাঁও থেকে বারসানাতে এসে রাধারাণী ও গোপীদের খেলার ছলে রাঙিয়ে দেয়। বারসানার মেয়েরা লাঠি দিয়ে এর প্রতিরোধ করে। আর নন্দগাঁও-এর ছেলেরা ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করে। বাঁশের লাঠি আর চামড়ার ঢাল। কথিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দিনে বারসানাতে এসে রাধাকে প্রথম রঙ লাগিয়ে ছিলেন। সেই থেকে প্রতিবছর ঐ দিনে লাঠমার হোলি অনুষ্ঠিত হয়।

লাঠমার হোলির উদ্বোধন বারসানার রাধারাণী মন্দিরে হয়। ভারতবর্ষে রাধার নামাঙ্কিত এই একটিই মন্দির আছে। লাঠমার হোলির আগের দিন 'লাড্ডু' হোলি হয়। অতি সুস্বাদু ঘিয়ের লাড্ডু প্লাস্টিক জড়িয়ে উপর থেকে, পাশ থেকে ছোঁড়া হয়। এই লাড্ডু পাবার জন্য দর্শনার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। রাধারাণী মন্দিরের ভিতরে খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নাচগান করে। শুকনো আবির মুঠো করে জনতার উদ্দেশে বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয় অথবা গুলাল জলে গুলে পিচকারী দিয়ে মন্দিরের প্রতিটি কোণায় দেওয়ার চেষ্টা হয়। এই আবির সৌভাগ্য-সমৃদ্ধির বার্তা বহন করে। কেউ কেউ এই আবিরকে শরীরে ধারণ করার জন্য মাটিতে গড়াগড়ি যায়। কোনো কিছুই অতিরিক্ত মনে হয় না। রাধারাণী মন্দিরে হোলি শুরুর পরে নন্দগাঁও-এর ছেলেরা বাইরে তিনমাথার মোড়ে এসে রাস্তার পাশে বংশদন্ড নিয়ে দন্ডায়মান সুসজ্জিত নারীদের সাথে লাঠমার হোলি খেলে। এর পরের দিন একইভাবে বারসানার ছেলেরা নন্দগাঁও-

এর মেয়েদের সাথে হোলি খেলতে নন্দগাঁও যায়। কাতারে কাতারে লোক শূন্যে আবির ছুঁড়তে ছুঁড়তে রাস্তা পরিক্রমা করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহল্লার প্রতিটি গলি জনতার দখলে চলে যায়। রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর ছাদে মানুষের ঢল। জনপ্রতি ৫০ থেকে ১০০ টাকার বিনিময়ে সেই জায়গা বিক্রি হয়। এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী জনতা খুবই সুশৃঙ্খল। কোথাও চাহনিতে বা শরীরি ভাষায় অমিলনতা নেই। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যথার্থই বৈষম্যহীন। এই জনস্রোত অন্তত একদিনের জন্য লিঙ্গ-বিষয়-বয়সের বৈষম্যহীন। দর্শনার্থীরা নতুন জামা-শাড়ি পরে দোল খেলতে আসে। নন্দগাঁও থেকে আসা ছেলেরা মাথায় রঙীন বাহারী পাগড়ী বাঁধে, ঐতিহ্যবাহী পোষাক পরে। আবার বারসানার মেয়েরা রঙিন শাড়ী-চুড়িতে সজ্জিত হয়।

২০১৭ সালের লাড্ডু হোলি হয়েছে ৬ই মার্চ। বারসানায় লাঠমার হোলি হয়েছে ৭ই মার্চ।

নন্দগাঁও-এর লাঠমার হোলি হয়েছে ৮ই মার্চ। মূল হোলি হয়েছে ১৩ই মার্চ।

দোল রঙের উৎসব। প্রকৃতির রঙ-মনের রঙ-আবিরের রঙ — সব মিলেমিশে একাকার। এরই মাঝে বিবর্ণতার ছিটেও থাকে। রাধারাণী মন্দিরে যাবার সরু গলিতে অসংখ্য মানুষ গিজগিজ করছে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ নিজস্বী তুলছে, কেউ মনের মানুষের হাত ধরে অগণিত মানুষের মাঝেও ভেসে চলেছে, কেউ বা রঙিন আকুলতায় নিজেকে ডুবিয়ে নিয়ে আত্মসমর্পণের চোরা চাহনিতে নিমজ্জিত, কেউ আবার রঙ দিয়ে অন্যের মুখমন্ডলে 'রাধারাণী'/'হোলি' ছাপ লাগাচ্ছে — দাতা-গ্রহীতা দুজনেই নীরব, কোথাও বা ক্ষীণদেহী শীর্ণকায়া মহিলাদের শূন্যতায় ভরা অপেক্ষার মিছিল। এসব মহিলারা পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে অকাল বৈধব্যের জ্বালা নিয়ে দুবেলা খাওয়া, বছরে দুটো কাপড় আর মাসিক সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে অষ্টপ্রহর নামগান করে। চারজনের এক-একটি দল। পালা করে সংকীর্তন করে। খোল-করতালের আওয়াজে তাদের হাহাকার ঢাকা পড়ে যায়। তাদের ভিতরের চাপা কান্না যত গভীর হয় ততই 'হরে কৃষ্ণ' নাম সাতখান হয়ে ভেঙ্গে যায়। এখানে কেউ তো স্বেচ্ছায় আসে না। পরিবার-পরিজন এদের এখানে রেখে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হয়। এদের জীবনের ভাঙ্গন পদ্মার ভাঙ্গনকেও হার মানায়। পড়ন্ত বিকেলের নরম আলোয় কি এদের মনে শৈশবের পেলবতা মাখা স্মৃতি উঁকি দেয় না? হয়তো দেয় কিন্তু কে আর খবর রাখে! কথাগুলো দীর্ঘশ্বাস হয়ে বাতাসে কানাকানি করে, বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। এরা এই বিশাল জনতার মাঝে চেনা মুখ খোঁজে। কিন্তু কেউ-কি খুঁজে পায়? বছরের পর বছর আকুলতায় ভরা এদের অপেক্ষা। এদের মধ্যে দু'একজন বাঙালি দেখে এগিয়ে এসে কিছু বলতে গেলে চাপা গলায় নিজের আসনে বসার নির্দেশ পায়। এরা তৎক্ষণাৎ ঘুপচি ঘরে ঝুপসি অন্ধকারে সেঁদিয়ে যায়। ভগবান প্রেমে বিলীন হয়ে নিজেদের অপ্রেম ঢাকে। পারে কি? অন্তরে-বাহিরে বে-রঙ নিয়ে আরও একবছরের অপেক্ষার জন্য নিজেকে শক্ত করে।

বারসানায় তৃতীয় লিঙ্গ মানুষদের উপস্থিতি নজরে পড়ার মতো। নজর কাড়ে তাদের মার্জিত রুচি। কথাবার্তায়-আচার আচরণে। তারা নিজেদের ঘরানার মধ্যে নাচ-গান-গুলালে মত্ত। নাচের দম অফুরান। নাচের তালে, ঠোঁটের হাসিতে-খুশিতে জীবনের স্পন্দন উপচে ওঠে। এদের নিজেদের কোনো সাকিন নেই। রাধাকৃষ্ণেরও তাই। তাই তো কোথায় যেন একাত্মতার চোরাস্রোত বয়ে যায়। লাঠমার হোলিতে মহিলাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। সম্বৎসর পুরুষদের কর্তৃত্ব কায়েম থাকে। ঐ একটি দিনেই মহিলারা বিজয়ীর হাসি হাসে। কোথাও কি লাঠির ঘায়ে সত্য কথা বলা হয়ে যায়, মন জুড়ায়? কে জানে।

কলকাতা থেকে রেলযোগে মথুরা পৌঁছানো যায়। মথুরা রেল স্টেশন থেকে ৬ কিমি. ব্যাসার্ধের মধ্যে বিভিন্ন মানের হোটেল আছে। মথুরা থেকে বারসানা যাওয়া যায়। অটো পাওয়া যায়। ৭০০-৮০০ টাকা ভাড়ায় পুরো অটো ভাড়া নিতে হবে। এই ভাড়া এক পিঠের। মথুরা থেকে বারসানার দূরত্ব কমবেশী ৩০ কিমি.। ফেরার সময় নিকটবর্তী বাস স্ট্যান্ড থেকে মথুরাগামী বাস বা রাস্তা থেকে ট্রেকার পাওয়া যায়। ফেরার পথে রাধারাণী মন্দির থেকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তাটা হেঁটে বা ভ্যানরিক্সায় আসতে হবে। তবে ভ্যানরিক্সার সংখ্যা খুবই সীমিত। লাড্ডু হোলির দিন যাবার সময় অটো মন্দির সংলগ্ন জায়গা পর্যন্ত যায়। কিন্তু লাঠমার হোলির দিন নিজের পায়ের উপরই ভরসা। প্রায় তিন কিমি. পথ অতিক্রম করতে হবে। অসুবিধা হয় না। অচেনা অনেকের সাথে টুকরো-টাকরা আলাপচারিতায় পা মিলিয়ে অনায়াসে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। তবে লাঠমার হোলির পুরো স্বাদ চেটেপুটে আস্বাদন করতে চাইলে বারসানাতে থাকা ভালো। বারসানাতে থাকার ব্যবস্থা খুবই সীমিত। বারসানা-নন্দগাঁও শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত জায়গা। এখানে ক্ষীরের তৈরী মিষ্টি বেশী পাওয়া যায়। সস্তা, সুস্বাদু। যাদের মিষ্টিতে অসুবিধা আছে তাদের জন্য অস্থায়ী ভাজাভুজির দোকান আছে। বারসানা থেকে নন্দগাঁও ৮ কিমি. দূরে। মথুরা থেকে অটো করে বা বারসানা থেকে বাস-ট্রেকারে করে যাওয়া যায়। দিল্লি থেকে সড়কপথে বারসানার দূরত্ব ১৬৫ কিমি.। অনেকেই দিল্লি থেকে গাড়ী করে দিনের দিন লাঠমার হোলির আনন্দ উপভোগ করে স্বস্থানে ফিরে যায়। মথুরা থেকে বৃন্দাবনের দূরত্ব ১২ কিমি.। বাসে করে বৃন্দাবন যাওয়া যায়।

মথুরার দাউজি মন্দিরে হুড়ুঙ্গা হোলি বিখ্যাত। কমলা রঙের জলে মন্দির চত্বর বর্ণিল হয়ে ওঠে। সকলেই ঐ রঙিন জলে স্নাত হতে চায়। এটাই দস্তুর। দ্বারকাধীশ মন্দিরে একসপ্তাহ ধরে হোলি অনুষ্ঠিত হয়। যতই মূল হোলির দিন সমাগত হয় ততই বাতাসের রঙ ঘন হয়। সকাল ৮টায় শুরু হয়ে ১০টার মধ্যে মন্দির প্রাঙ্গণ খালি। মন্দিরের মূল ফটক বন্ধ। দ্বারকাধীশ মন্দিরে প্রথমে শুকনো

আবির দিয়ে খেলা শুরু হয়। মন্দিরের পূজারী থালায় করে লাল আবির জনতার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেয়। এই ঘটনা পরের পর অনেকবার ধরে চলে। যদি কেউ সৌভাগ্যের প্রতিভূ এই আবির থেকে বঞ্চিত হয় তখন জনতার আবেদনে মন্দিরের পুরোহিত আবারও থালায় করে আবির ছুঁড়ে দেন। এরপরে আরম্ভ হয় জল দিয়ে গোলা তরল আবির পিচকারী দিয়ে দেওয়া। মন্দির চত্বর শুকনো আবিরে জল পড়ে পিচ্ছিল অবস্থা। খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। মন্দিরের খোলা জায়গায় বড় একটা চামড়ার তৈরী ড্রামে (অনেকটা আদিবাসীদের ধামসার মতো দেখতে) কাঠের তৈরী লাঠি দিয়ে ক্রমান্বয়ে আঘাত করা হয়। এই আঘাতজনিত কারণে গম্ভীর আওয়াজ তৈরী হয়, বাতাসে মিশে যায়। মন্দিরের ছাদ থেকে ঝোলানো মাইকে সকলে সমস্বরে হোলির গান গায়। একনাগাড়ে এই চিৎকারে গলার স্বরে চিড় ধরে। তবুও বিরাম নেই। মন্দিরের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা মন্দিরে আগত দর্শনার্থীদের হাত ধরে টান দেয়, রাধাকৃষ্ণের নাচ নাচবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। সুবেশা তরুণী-যৌবন উত্তীর্ণা মাঝবয়সী মহিলা-চামড়া লোল হয়ে ঝুলে পড়া বৃদ্ধা - সব বয়সী পুরুষ একযোগে দু-হাত তুলে পুরনো ঢঙে অথবা আধুনিকতার ছোঁয়া লাগা কোমর দুলিয়ে নাচতে থাকে। এখানেই মুম্বাই-এ থাকা উচ্চপদে আসীন একটি ৩০-৩২ বছরের মেয়ের সাথে দেখা। প্রতি বছর আসে। শুধুমাত্র মথুরা-বৃন্দাবনের হোলির আনন্দে আবেশিত হবার জন্যে। চুল উঁচু করে বাঁধা, বন্ধনহীন নাচ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলে। ভাবা যায়! আবেগ কোন্ পর্যায়ের। মন্দিরের রংও লাল। লাল আবিরের সাথে তাল মিলিয়ে। মন্দিরের সাদা-কালো চৌখাপ্পা মেঝে। তবে হোলির দিনগুলোয় আলাদা করে চেনা যায় না। বিদেশীদের মনেও এই আমোদের রেশ থাকে। তাঁরাও শেষের দিকে অনভ্যস্ত পদচারণায় নাচে অংশগ্রহণ করেন। আর অনেকেই ঠান্ডাই, ভাঙ্গ মিশ্রিত পানীয় খেয়ে এখানে আসে। চোখে ঘনঘোর কাজল। ঘোর লাগে মনেও। কথাবার্তাতে তার ছাপ স্পষ্ট।

সকালের পরে বিকেলে মথুরার গলিতে হোলি হয়। রথের মতো চাকাওয়ালা গাড়ী থেকে আবির ছুঁড়তে ছুঁড়তে নগর পরিক্রমা করা হয়। আশেপাশের বাড়ি থেকে সকলে রাস্তার ধারে জমায়েত হয়। আর একই কায়দায় পরস্পরের মধ্যে আবির দেওয়া-নেওয়া চলে।

বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী মন্দিরের হোলিও বর্ণিল। তবে ফুলেল। মন্দিরে প্রবেশের অনেকগুলো দ্বার আছে। প্রত্যেকটির বাইরে জনতার ঢল, অপেক্ষার দীর্ঘ সারি। গেট নং ১ থেকে ক্রমান্বয়ে পরপর গেটগুলো খোলা হয়। যখন ৩ নং দরজা খোলা হয় তখনও ভিতরে ১ নং-২ নং গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশিত ভক্তরাও আছেন। ভিতরে তখন হুলুস্থুল, দম বন্ধ করা অবস্থা। এই অবস্থায় চশমা আর আপনার মধ্যে দূরত্ব বাড়তে পারে। তো সাবধান। ভিতরে ঢুকলে বিস্ময়। উপরে সাদা ফুলের চাঁদোয়া। দোতলার উপর থেকে পুষ্প বর্ষণ হয়। গর্ভমন্দির থেকে ভক্তদের উদ্দেশ্যে আবিরের-গোলা, গোলা-আবির ছুঁড়ে দেওয়া হয়। ভক্তরাও দেবতার উদ্দেশে আবির ছোঁড়েন। মুখে জয় রাধে-জয় কৃষ্ণের উচ্চকিত ধ্বনি। ভিতরে আলো-আঁধারি। সব মিলিয়ে মোহময় পরিবেশ। ভিতরে বিগ্রহের ছবি তোলা নিষেধ। কিন্তু সবাই যথেচ্ছ ছবি তুলছে। যদি আপনি কারো কু-নজরে পড়েন তো আপনার ক্যামেরা নিয়ে টানাটানি হবেই।

বৃন্দাবনের হোলি যেমন বিখ্যাত এখানকার বাঁদর তেমন কুখ্যাত। অসচেতন পর্যটকরা পরখও করেছেন। আমারই সঙ্গীর চোখে চশমা, নিমেষে তা উধাও। বাঁদরের হস্তগত। বাঁদর রাস্তার পাশের দোকানের ছাদে। কি করে চশমা আবার চোখে উঠবে এই ভাবতে ভাবতেই এক ত্রাতার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। প্রস্তাবিত বিনিময় মূল্য ১০০ টাকা। রফা ৫০ টাকায়। ছেলেটি এক প্যাকেট ঝুরিভাজা বাঁদরটিকে মাপা ক্যাচ দিল এবং বাঁদরটিও তা লুফে নিল। এরপর আরও এক প্যাকেট ঝুরিভাজা ছুঁড়ে দিতেই বাঁদর চশমা ছেড়ে ঝুরিভাজাতে আকৃষ্ট। অতঃপর ছেলেটি চশমার দখল নিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সবারই হাত চশমার দু'দিকের ডাঁটিতে।

বারসানার হোলিতে নিজের জুতো জোড়া সাবধান। সরকারী জুতো রাখার জায়গা অনেক দূরে। মন্দিরে প্রবেশ আর নির্গমনের রাস্তা আলাদা। তাই অনেকটা পথ খালি পায়ে হাঁটতে হবে। যত্রতত্র জুতো খুলে রেখে গেলে স্বস্থানে জুতো জোড়া ফিরে পাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই জুতো নিজের দায়িত্বে রাখাই ভালো। মথুরা-বৃন্দাবনে বিভিন্ন দোকানে জুতো রাখার ব্যবস্থা আছে।

বিদেশীদের যদি ভ্যালেনটাইন্স ডে থাকে তো আমাদেরও সরস্বতী পুজো, দোল আছে। সরস্বতী পুজোর শ্রীপঞ্চমীতে এর সূচনা আর দোলে এই বৃত্তটা সম্পূর্ণ। রঙ বাসন্তী থেকে লাল। কোথায় চকোলেট-গ্রিটিংস কার্ড-গোলাপ আর কোথায় শাড়ী-চুড়ি-পলাশ-আবির। গোলাপ লালিত আর পলাশ আলুলায়িত। আবিরের লালিমায় আরক্তিম কপোল মিলেমিশে একাকার। চুড়ির টুংটাং শব্দ মনের কথার বাহক। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিকে যতই সামনে রেখে পুজো করা হোক না কেন রাধার জীবনে কোথাও যেন একটা না পাবার বেদনা আছে। তাই তো এই অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের কাছে তিনি রাধারাণী। সম্মানসূচক ডাক। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কণ্ঠস্বরে রাধারাণীর প্রতি সম্ভ্রম ঝরে পড়ে। এটা তো কষ্ট করে অর্জিত নয়, এটা স্বতঃস্ফূর্ত। এখানে রাধার জনপ্রিয়তার কাছে শ্রীকৃষ্ণ কিছুটা ম্লান। এ অঞ্চলের মানুষজনদের প্রাত্যহিকতার সঙ্গেও রাধারাণী জড়িয়ে আছেন। রিক্সাওয়ালা পথচারীকে রাস্তার একপাশে সরতে বলবে 'রাধে রাধে' বলে, খুচরো বিক্রেতা সম্ভাব্য ক্রেতাকে ডাকবে 'রাধে রাধে' বলে। সর্বত্রই রাধারাণীর অস্তিত্ব। তাই তো রাধা-রাধে-রাধারাণী ডাক যেন "আমার সকল কর্মে লাগে।"

(আরও রঙীন ছবি শেষের পাতায়)

আবেগে স্মরণে একটি রাত

প্রবীর বসু

চুরুলিয়াগামী দিনের শেষ বাস আসানসোল বাস স্ট্যাণ্ড থেকে সবে মাত্র ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। এখন সময় সন্ধ্যা ৬-১৫। সরাসরি চুরুলিয়ার বাস চলে যাওয়াতে আমরা বেশ সমস্যায়। উপস্থিত বাসযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম আধ ঘন্টা পর দোমোহিনীর বাস ছাড়বে। ঐ বাসে দোমোহিনী পৌঁছে অন্য কোনো ব্যবস্থা করে ৫-৬ কিমি. দূরের চুরুলিয়া পৌঁছোনো যেতে পারে। আমরা চলেছি ৩৭তম নজরুল মেলাতে। সপ্তাহব্যাপী নজরুল মেলার সেদিনই শেষ রাত। শেষ রাতের বিশেষ আকর্ষণ লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান। সারা রাতব্যাপী অনুষ্ঠান।

বেশ কিছুদিন ধরে মনে ইচ্ছা নজরুল মেলা দেখতে যাব। যাওয়া হয়ে উঠছে না। হঠাৎ ১লা জুন, ২০১৫ (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২) সকালের খবরের কাগজে চোখে পড়ল আজ নজরুল মেলার শেষ রাত। রাত ভোর অনুষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে কথা বললাম কাজী মজাহার হোসেনের সঙ্গে (সম্পাদক, নজরুল অ্যাকাডেমি, কবিতীর্থ, চুরুলিয়া)। তিনি বললেন আজই আসুন। বার্ষিক অনুষ্ঠানের পরিবেশ স্বতন্ত্র। সাধারণ দিনে এলে মেলার সাংস্কৃতিক উৎসবের ভারত-বাংলাদেশ সমন্বয়ী উৎসবের সে জৌলুস কি থাকবে? আপনি যখন আসতে চান, আজই আসুন। এও জানালেন অনুষ্ঠান চলবে ২রা জুন, ২০১৫ ভোর রাত পর্যন্ত।

দোমোহিনীর বাসে চেপেছি। বাস ভর্ত্তি যাত্রীর বিভিন্ন প্রস্তাব কিভাবে আমরা শেষ পর্যন্ত চুরুলিয়া সময় মত পৌঁছাবো। কেউ বলছে আগের বাসের কন্ডাকটরকে ফোন করে দোমোহিনীতে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করুন। আবার কেউ কেউ আশ্বস্ত করছে বাস না পেলেও রিজার্ভ কোনো গাড়ীতে ঐ শেষ ৭ কিমি. পথ পৌঁছে যেতে পারবেন। এর মধ্যেই বাসের মধ্যে মেলা নিয়ে টুকরো আলোচনা সমালোচনা। অবশেষে বাস কন্ডাকটরের অনুরোধে চুরুলিয়ার পাশের গ্রামের একটি ছেলে দোমোহিনী বাস স্ট্যান্ড থেকে মোটর সাইকেলে চাপিয়ে সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে আমাদেরকে চুরুলিয়া গ্রামের দোরপ্রান্তে পৌঁছে দিল।

সংকীর্ণ রুখু সুখু গ্রাম্য পথ। পূর্ণিমার আগের রাত কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কখনও সখনও মেঘের আবরণ সরিয়ে মেঘের উঁকিঝুঁকি। মুহূর্তেই কর্তব্যরত মেঘের দল তীব্র আক্রোশে পূর্ণিমার চাঁদকে বন্দী করে যেন পরিতৃপ্ত। এই পরিবেশে ২০১৫-র জুনের প্রথম দিনটিতে সারাদিনের ধকল সয়ে প্যাচপ্যাচে গরমে সুদূর হালিশহর থেকে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামের নজরুল অ্যাকাডেমির প্রমীলা মঞ্চের পথে এগিয়ে চলেছি। রাত ঠিক ৮টা। নজরুল অ্যাকাডেমিতে পৌঁছে প্রথমেই নজর পড়ল মিউজিয়মের দিকে। মিউজিয়ম রাত ৯টায় বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই প্রথমেই একটি কক্ষে প্রবেশ করলাম যেখানে নজরুলের ব্যবহৃত পোষাক-আশাক, পান্ডুলিপি, দেওয়াল জুড়ে চতুর্দিকে অসংখ্য ছবি। নজরুলের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি। বিদ্রোহী কবির বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনকারীদের উদ্দীপ্ত করবার বিভিন্ন সংগীত মুহূর্ত। বহু নামী দামী প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আবার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সুখ-দুঃখের ছবি। কবিতা আর গানের মাধ্যমে তার বিদ্রোহী প্রতিবাদী চরিত্রের প্রকাশ। কিন্তু এত কিছুর পরেও বলতে দ্বিধা নেই সবই যেন মলিন-অপরিচ্ছন্ন। বেশ কিছু ছবি, পান্ডুলিপি, পোষাক আশাক বিবর্ণ ধূলায় ধূসর। প্রয়োজন উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং আর্থিক অনুদানের। অন্যথায় নজরুল অ্যাকাডেমির মত প্রতিষ্ঠানের সামাজিক কার্য্যাবলী, নজরুলের বিদ্রোহী বার্তা, তার চিন্তাভাবনা, দেশপ্রেম, ধর্ম নিরপেক্ষ চেতনা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং পরিণতিতে এরকম একটি ঐতিহ্যমন্ডিত প্রতিষ্ঠান অপমৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবে।

এগিয়ে চললাম কবি পত্নী প্রমীলা সেনগুপ্তের সমাধির পথে। পাশেই কবির পূর্ণমূর্ত্তি। কবির পূর্ণমূর্ত্তির দিকে চেয়ে হতাশ। কবির অসম্ভব সুন্দর দীপ্ত চেহারা অথচ এ কোন মূর্ত্তি? একি আমাদের পরিচিত তেজদীপ্ত, বিদ্রোহী কবি নজরুল? এবার চলেছি মেলার পথে। প্রতি বছর ১১ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ৭ দিনের জন্য নজরুল অ্যাকাডেমি এই মেলার আয়োজন করেন। দিনভর থাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচী, রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভারত-বাংলাদেশ জুড়ে এ এক সমন্বয়ী অনুষ্ঠান। এ বছর এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছেন মাননীয় শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (প্রাক্তন স্পীকার, লোকসভা)। এসেছেন ডঃ সমসুজামান খান (মহা পরিচালক, বাংলা অ্যাকাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ)। ভারত-বাংলাদেশের বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষ, নজরুল বিশেষজ্ঞ এই মেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রমীলা মঞ্চের সামনে যখন এসে পৌঁছলাম তখন রাত ৯টা। মঞ্চের সামনে প্রশস্ত জায়গা। প্রায় হাজার দুয়েক মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। রয়েছে বেশ কিছু চেয়ার আবার মাটিতে বসবারও ব্যবস্থা আছে। মানুষ মেলার আনন্দের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মঞ্চের অনুষ্ঠানও উপভোগ করছেন। রাতভর অনুষ্ঠান। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, কবিগান, বাউল, ছৌ নাচ, বিহু নৃত্য আরও কত

কী! দূর দূরান্ত থেকে শিল্পীরা এসেছেন ৩৭তম নজরুল মেলায় অংশগ্রহণ করতে।

নজরুলগীতির পর শুরু হল সমবেত নৃত্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ বিষয়ক নৃত্যনাট্য। মঞ্চ জুড়ে সে যেন এক আবেগ বিহ্বল পরিবেশ। মুহুর্মুহু ধ্বনিতে উপস্থিত দর্শক যেন অভিভূত, উদ্বেলিত।

পরবর্তী অনুষ্ঠান নাটক - আঞ্চলিক শিশুশিল্পী সমন্বয়ে আমরা ছাত্রদল কর্তৃক "শিক্ষা চাই" নাটক। সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনে শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে এ নাটক। পরিচালক শেখ সামিনুদ্দিনের এ এক উজ্জ্বল প্রযোজনা।

কবির টানে সুদূর আসামের বোরো অঞ্চল থেকে এসেছেন শ্রীময়ী বরা ও নীলোৎপল বরা সম্প্রদায়। তারা বিহু গান ও গীটারে আসামের লোকগান পরিবেশন করেন।

বারাসাতের নীলাঞ্জন চক্রবর্তী সম্প্রদায় পরিবেশন করেন মনোগ্রাহী শ্রুতিনাটক "জাগো সুন্দর চির কিশোর।" রাত বাড়ছে, রাতের সঙ্গে সঙ্গে মেলার ভীড় যেন উপচে পড়ছে। বিদ্রোহী কবির নাম এ মেলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সে যেন আঞ্চলিকতার গণ্ডী পেরিয়ে দূর-দূরান্তে প্রসারিত হয়েছে।

এরপর দুবরাজপুর, কাটোয়া বোলপুর অঞ্চল থেকে আগত বাউল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতির নামে বজ্জাতি, কবির বিদ্রোহী প্রভৃতি - এসব নানা বিষয়ে বাউল গানের উচ্চ নিনাদে যেন এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কানায় কানায় পূর্ণ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ কবির স্মরণে মুখরিত হচ্ছে প্রতিটি মূহুর্তে।

প্রায় মধ্য রাত্রে মঞ্চে এলেন মুর্শিদাবাদের দুলালী চিত্রকর তার কবিগান সম্প্রদায়কে নিয়ে। কবিগানের অনুষ্ঠান সে রাতে দর্শকদের যেন এক বিশেষ প্রাপ্তি। ভাববাদ আর বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব। পক্ষে-বিপক্ষে অকাট্য যুক্তিতে দিশাহারা দর্শক। বস্তুবাদের পক্ষে সমাজের কঠিন রোগ — সাম্প্রদায়িকতা। জাত-পাত, অধুনা রাজনীতির দলদাস কোনো কিছুই বাদ গেল না। বস্তুবাদে শিক্ষার মাধ্যমে চেতনা, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজ উন্নয়ন, দলদাস প্রথা ছেড়ে মানুষের প্রয়োজনে রাজনীতির বাস্তব দিক সুচারুভাবে উপস্থাপন করেছেন। দর্শকের প্রশস্তিও পেয়েছেন। এবার ভাববাদের পালাকার বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতার পাশাপাশি এক অদৃশ্য শক্তির কথা বলেছেন। সমস্ত উন্নত বিজ্ঞান শেষেও সেই সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব বুঝিয়েছেন। একটি ছোট্ট উদাহরণ বোধ হয় না উল্লেখ করলেই নয়। পালাকার বলেছেন, পরিবারের অসুস্থ মানুষটিকে ভাল ডাক্তারবাবুকে দিয়ে অপারেশনের ব্যবস্থা করেছেন। ডাক্তারবাবুকে বলছেন যেন অপারেশন সফল হয়, রোগী রোগমুক্ত হয়। ডাক্তারবাবুকে বারংবার অনুরোধ করায় জ্ঞানমনস্ক ডাক্তারবাবু পরিবারকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বললেন, আমি ডাক্তারবাবু শেষ চেষ্টা করব। কিন্তু ডাক তার চলে এলে আমি ডাক্তারবাবু কি করতে পারি? অর্থাৎ এক বিশেষ শক্তি শেষ কথা বলবে। কাজেই ভাববাদ পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত অজেয় থাকবে। এ অনুষ্ঠান শেষে মনে হল কবিগান সত্যিই এক অতি পুরাতন বাংলা সংস্কৃতি। তবুও আজ গ্রামীণ পরিবেশেও সে যেন তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারছে না। কিন্তু সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষা রোধে, সমাজ-সচেতনতা বৃদ্ধিতে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এ এক উন্নত মাধ্যম।

রাত তখন ৩টে। মঞ্চে এলেন বাঁকুড়ার ছৌ নাচের দল। পালা মহিষাসুর মর্দিনী। নারী শক্তির এক অপূর্ব নিদর্শন। নারী শক্তির কাছে পর্যদুস্ত অশুভশক্তি। অসাধারণ প্রযোজনা। সমগ্র অনুষ্ঠানের মান সত্যিই উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। ঘোষক সুপ্রিয় কাজির অসাধারণ অনুষ্ঠান পরিচালনায় রাত ভোর অন্ততঃ হাজার পাঁচেক মানুষ কবির স্মৃতিধন্য এ অনুষ্ঠানে উদ্বেলিত হয়েছেন। সার্থক হয়েছে নজরুল একাডেমির এই বার্ষিক প্রচেষ্টা।

রাত তখন ৩-৪৫। বেশ অন্ধকার — ধীরে ধীরে চললাম গ্রাম্য পথ ধরে আধো অন্ধকারে গ্রামের হাটতলায় কবির আবক্ষ মূর্তির পাশে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। হঠাৎ মনে পড়ল কবি ও প্রাবন্ধিক আজিজুল হক-কে লেখা কবির একটি পত্রের কয়েকটি লাইন। নিজের সম্পর্কে আত্মসমীক্ষায় নজরুল বলেছেন, "আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মত। হয়তো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বিস্ময় থাকবে না বেশিদিন। ধূমকেতু যেমন সহসা আসে, তেমনি সহসা চলে যায়। তোমরা আমাদের আকাশের অনাগত জ্যোতিষ্ক, গ্রহপুঞ্জ। তোমরা যেদিন রূপ ধরে উঠবে, সেদিন তোমাদের আড়াল করে থাকার প্রয়োজন হবে না — এ ধূমকেতুর। আমার সমস্ত লেখায়, কামনায় এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে — তোমরা এসো অনাগত কবির দল। আমি ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে গেলাম। তোমরা ভোরের পাখি, তাদের গান শুনিও।"

সময় হয়েছে। ভোর ৪-৩০এ আসানসোল যাওয়ার বাস আসবে। গ্রামের পথে যাত্রী তুলে ভোর ৫টা নাগাদ এগিয়ে যাবে আসানসোলের পথে। কবির স্মৃতিধন্য ৩৭তম নজরুল মেলাতে বিদ্রোহী কবির আবেগে স্মরণে কাটিয়ে এলাম জীবনের এক অবিস্মরণীয় রাত।

"মা"

কমল সেন

ভ্রমণের সঙ্গে দর্শন। ভ্রমণ কি দর্শন নয়? সমুখে দু-নয়ন মেলে যা দেখছি সে এক। পরবর্তী সময়ে মননে তাকে দেখছি সে আর এক সুখানুভূতি বা দুঃখ ভরা দর্শন। (Philosophy Philos অর্থাৎ অনুরাগ Sophia অর্থাৎ জ্ঞান)। ভ্রমণের প্রতি অনুরাগ, তার মাধ্যমে অজানা ইতিহাসের জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া। অপার্থিব ঈশ্বর দর্শন, পার্থিব মূর্তির মাঝে দেবদেবী দর্শন। ন্যায়ীকরা এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন। এটা আমার কাজ নয়।

আমার এই কাহিনীর নেপথ্যে আর এক কাহিনী আছে যা না বললেই নয়। ভদ্রেশ্বরের ভ্রমণ আড্ডার কোন এক মাসিক বৈকালিক আড্ডায় চন্দননগর মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক একক বক্তা হিসাবে ভ্রমণ সম্বন্ধে ইতিহাসের পাতা থেকে নিয়ে ভূগোল-সামাজিক অবস্থান বিভিন্ন বিষয়ে এত সুন্দরভাবে বলেছিলেন, কিন্তু সেসময়ে ব্যক্তিগত জীবনে ভারতের অনেক রাজ্যই বেড়ানো বা ভ্রমণ হয়ে গেছে। আপশোষ হল সত্যি সেভাবে তো দেখিনি। কত স্থাপত্য কলা, মন্দির, মসজিদ, দুর্গ, মরুভূমি, হিমালয়, ঝর্ণা। এরও মাঝে যে জীবন্ত দেবদেবীর দর্শন পাওয়া যায়। সে তো ভাবিনি।

এমনি একদিন সস্ত্রীক স্থানীয় ট্যুর অপারেটরের সাথে আঠাশ দিনের অন্ধ্রের তিরুপতি দিয়ে শুরু করে তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক দেখে ব্যাঙ্গালোরে যাত্রা শেষ। তিরুপতির বালাজী দর্শন করে চেন্নাই পৌঁছানো গেল। চেন্নাই থেকে একুশজনের দল। ওরা বলে মিডি ট্যাক্সি অর্থাৎ আমাদের এখানকার মিনিবাসে চেপে যাত্রা শুরু। প্রথমেই মহাবলীপুরম। সপ্তম শতাব্দীর পল্লব বংশের পুরাকীর্ত্তি। সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া কোন এক সুনামীর ফলে চাপা পড়ে থাকা পুনরুদ্ধার। পাথর কেটে কেটে হাতি, মন্দির নির্মাণ। অপলক নয়নে দেখা। কখনও লেন্সে বন্দী করা।

আমার কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে হাজার বছরকে পেছনে ফেলে বর্তমান, বাস্তব, বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থা, দারিদ্রতা ও এক ক্ষুধার্ত দেবীর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়, যেখানে দক্ষিণ ভারতের টন টন সোনা, হীরে, জহরত দিয়ে মোড়া দেব-দেবীর মুখও ম্লান হয়ে যায়।

মহাবলীপুরম থেকে পন্ডিচেরীর দিকে এগিয়ে চলেছি। সকালবেলা যাত্রা শুরু। ইতিহাসকে পেছনে ফেলে বর্তমানের সুন্দর পীচ ঢালা রাস্তা কখনও প্রশস্ত কখনও বা সরু। মাঝে মাঝে রাস্তার দু-ধারে সবুজ শ্যামলীমা। সময় গড়িয়ে দুপুর। যথারীতি বাস থামাল। জায়গাটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। বড় গাছের ছাওয়া। পাশে সবুজ ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝে বোরিং কুয়ো থেকে ক্ষেতে জল দেওয়া হচ্ছে। রাস্তায় তেমন গাড়ি চলাচল নেই। গ্রামই বলা যায়। রান্নার তোড়জোড়। রাস্তার এদিকে ওদিক তাকিয়ে দেখলাম ওপারে ফুটপাতের ধারে পাতার ছাউনি দেওয়া খুঁটির ওপর একটা চালাঘর। গিন্নীকে বললাম — চল দেখি ওটা কি। ছোট এক দোকান ঘর সমুখে উনুন। একজন মধ্যবয়স্কা রমণী বসে। পাশেই বাঁশের বেঞ্চি, ছয় ইঞ্চি চওড়া তক্তার টেবিল। পাশে স্টীলের গামলায় মনে হল চাল-ডাল গোলা। উনুনের ওপর এক বিরাট চাটু। বোঝা গেল ধোসার দোকান। কিন্তু খরিদ্দার কই? হঠাৎ দেখা গেল দু-জন খালি পা লুঙ্গি পরা লোক এসে দুর্বোধ্য তামিল ভাষায় কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা শুকনো গাছের ডালপালা গুঁজে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তাওয়ার ওপর অর্ধেক নারকেল মালার হাতা দিয়ে গোলা ঢেলে দুটো ধোসা করে ফেলল। কিন্তু সাম্বার নেই। মহিলা ভেতর দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় কিছু বলল। আওয়াজ এল আরও এক মেয়েলী কণ্ঠের। শেষ বাক্যটি বোঝা গেল "আম্মা"। সঙ্গে সঙ্গে ছোট দু-টুকরো কলা পাতায় হলুদ রঙের কিছু বাটা নিয়ে এল। বাইশ-তেইশ বছরের এক বউ, সিঁথীতে সিঁদুর। আমাদের দুজনকে দেখে ও আশ্চর্য্য হল। মাকে কিছু জিজ্ঞেস করল। আকারে ইঙ্গিতে বোঝা গেল আমরা কে। ওর মা দূরে ট্যুর পার্টির দিকে দেখাল। বউটি ঘাড় একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে ঘোরাল। গিন্নীকে বললাম — চল একটা করে ফাইভস্টার ধোসা খাওয়া যাক। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব পাস। কেন জানিনা এই দক্ষিণ ভারতীয় খাবার বাঙালী বউ-মেয়েদের খুব পছন্দের। একটু বেশী কড়া করে ভাজা ধোসা ও তেঁতুল মেশানো খুব টক চাটনী। খাচ্ছি এমন সময় বউটি আমাকে ওর তামিল ভাষায় হাত নাড়িয়ে কিছু বলতে শুরু করল। বোঝা গেল ও জানতে চাইছে আমাদের কি কি রান্না হচ্ছে? আমি বোঝালাম ডিমের ঝোল ও ভাত। বউটি বড় বড় চোখ করে বলল আমরা ওকে ভাত ও ডিম দেবো কিনা। গিন্নী বলল ও কি খেতে চাইছে? ওর ভেতর থেকে আগত আত্মা খেতে চাইছে। ও যে অন্তঃসত্ত্বা। আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম দেব।

যথারীতি প্রস্থান। আমাদের ট্যুর পার্টির রান্না শেষ। ফটাফট্ হাসপাতাল মার্কা স্টীলের থালা বেরিয়ে এল। ভাত, ডাল, আলুভাজা, ডাবল ডিমের ঝোল ঢালা হয়ে গেল। আমি উড়িষ্যাবাসী রাঁধুনী ভজহরিকে বললাম বেশী বেশী করে ভাত-ডাল দে। ও বলল আপনারা তো এতো বেশী ভাত খান না। আমি বললাম তুই দে আজ খাব। ও দিল। আমরা থালা দুটি নিয়ে ঐ হোটেলের দিকে চললাম। হোটেলে ঢুকে আমাদের একটি থালার সমস্ত ভাত ও দুজনের চারটি ডিমই ওদের এক স্টীলের গামলায় ঢেলে দিয়ে ঈশারায় বউটিকে আমাদের সামনে বসে খেতে বললাম। একটু গাঁইগুঁই করল। পরক্ষণেই ঝপ্ করে মাটিতে বসে খেতে শুরু করে দিল। সামান্য কিছু ভাত ও একটি ডিম ওর গামলায় রেখে দিল। হয়ত বা ওর মার জন্য। আমরা দুজনায় অপলক নয়নে ওর সেই পরম তৃপ্তিতে আহার দেখতে লাগলাম।

আজ যখন বড় বড় বিয়েবাড়ী, বড়লোকেদের শ্রাদ্ধবাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যাই, তখন দেখি অর্ধেক খেয়ে, অর্ধেক অপচয় করে ভদ্রবেশী সুধী সমাজ নির্লিপ্ত নয়নে পান চিবোতে চিবোতে হাতে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে এমনভাবে চলে যান যেন গৃহকর্তাকে কৃতার্থ করা হল।

সে সময় আমার মননে, দু-নয়নের মাঝে চিদাকাশে এক মৃন্ময়ী ক্ষুধার্থ মাতৃমূর্ত্তি ভেসে ওঠে। সে যে এক মা।

সোঁদরবনে নানুবাবু

তন্ময় ভট্টাচার্য

সুন্দরবনের অন্তর্গত বাসন্তী স্কুলে এক বছরের চাকরী নিয়ে গিয়েছিলেন নানুবাবু। যাওয়ার পিছনে ছিল এক অবাস্তব গল্প।

নানুবাবুর মামা ছিলেন দাঁতের ডাক্তার। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরী। তখন ছিলেন দন্ডকারণ্যে। রিফিউজি ক্যাম্পে চিকিৎসা করতেন। ক্যাম্পে চিকিৎসা করে বিকালের দিকে একবার বনের মধ্য দিয়ে ফিরছিলেন। জঙ্গলে এক বাঘের উপদ্রবের কথা মামা কিছুদিন আগে শুনেছিলেন। কিন্তু সে দিনই সে বাঘ মামার সঙ্গে মোলাকাত হবে স্বপ্নেও ভাবেননি। সামনে বাঘকে দেখে মামা না ঘাবড়ে চিকিৎসা করার ব্যাগ থেকে দাঁত দেখার জন্য এক গোলীয় দর্পণ বার করে বাঘের সামনে ধরে বসলেন। তৎক্ষণাৎ ঘটে গেল চমক। বাঘ বাবাজী আয়নায় মুখ দেখেই দে ছুট। তারপর সে জঙ্গল থেকেই বাঘ হাওয়া।

ছোটবেলায় মামার মুখ থেকে সেই গল্প শুনে শুনে নানুবাবুর একেবারে মুখস্থ। মনের মধ্যে একটা সুপ্ত ইচ্ছে ছিল বনে গিয়ে একবার বাঘ দেখা।

চাকরী জীবনের প্রথমেই নানুবাবুর সুযোগটা এসে যাওয়াতে বাড়ির নিষেধ সত্ত্বেও চাকরীটা হাতছাড়া করতে পারেন নি। এক বছরের ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে চাকরী। বাড়িতে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করানো। বিজ্ঞাপনে ইন্টারভ্যু-এর সময়টা দেখে নানুবাবুর একটা খটকা লেগেছিল। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা। কত লোকের ইন্টারভ্যু কে জানে! চাকরীটা আদৌ হবে তো?

ইন্টারভ্যুর দিনে আর এক বিপত্তি। সকাল থেকেই ঝড় বৃষ্টি। পথের দূরত্ব তো কম নয়। বাড়ি থেকে শেয়ালদা ট্রেনে ঘন্টাখানেকের রাস্তা। ওখান থেকে ক্যানিং আড়াই-তিন ঘন্টা। তারপর মাতলা নদীতে লঞ্চ।

নানুবাবুর চরিত্রটা একটু জানলে পাঠকের নানুবাবুকে বুঝতে হয়ত একটু সুবিধে হবে। খুব ছোটবেলায় প্রাইমারী স্কুলে নানুবাবুকে এক মাস্টার আকারণে বকাবকি করাতে নানুবাবু মাস্টারকে হুমকি দিয়েছিলেন এই বলে, বাড়ির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় মাস্টারের ঠ্যাঙ দাদুর লাঠি দিয়ে ভেঙে দেবে। আজ থেকে বছর চল্লিশ আগে যখন মাস্টারমশাইকে সকলে শিক্ষাগুরু বলে মানত, যমের মত ভয় করত, নানুবাবু সেই সময় হুমকি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কলেজ জীবনেও একবার শুধুমাত্র কলমের ওপর রুমাল চাপা দিয়ে হোস্টেলে বেআইনীভাবে দখল করা ছাত্রদের হোস্টেল ছাড়া করেছিলেন। আবার স্কুল জীবনে নিজে একটা অন্যায় করাতে সরাসরি হেড স্যারের কাছে গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি চেয়েছিলেন।

নানুবাবু বাসন্তী স্কুলে ইন্টারভ্যু দিতে সকাল সকাল বাড়ি থেকে বের হলেও ক্যানিং পৌঁছোতে ১১টা বেজে গেল। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলেও লঞ্চঘাটে যাওয়ার রাস্তাটা কর্দমাক্ত পিচ্ছিল। শারীরিক কসরত করতে করতে লঞ্চে উঠে বসতে না বসতেই লঞ্চ দিল ছেড়ে। বৃষ্টি আবার শুরু হল। একে বৃষ্টি, তার ওপর টেনশন। পথের সৌন্দর্য এ যাত্রায় নানুবাবু উপভোগ করতে পারলেন না। পথে দু-তিন জায়গায় লঞ্চ থেমে মাতলা থেকে হোগলা নদীতে লঞ্চ ঢুকতে সারেঙ্গকে বলতে শোনা গেল, বাসন্তী আসছে। বিকেল তিনটেয় বাসন্তীতে নানুবাবু পদার্পণ করলেন। লঞ্চ ছেড়ে দিল, যাবে গোসাবা।

বাসন্তীতে নেমে মিনিট দশ হেঁটে স্কুল। স্কুলে ইন্টারভ্যু নেওয়ার লোকজন বসে থাকলেও তখন আর ইন্টারভ্যু দিতে আসা প্রার্থীদের কেউ নেই। নানুবাবু শুনলেন আগে দুজন প্রার্থী এসেছিল। তিনিই শেষ প্রার্থী। ইন্টারভ্যু শেষে জানিয়ে দেওয়া হল নানুবাবুই সিলেক্ট হয়েছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জয়েন করতে হবে।

থাকা-খাওয়া ফ্রি। স্কুলের পাশে এক পাকা বাড়িতে। বিনিময়ে বাড়ির দু-একজন ছেলেমেয়েকে একটু পড়া দেখিয়ে দিতে হবে। নানুবাবু রাজি। এখানে থাকতে পারলে সুন্দরবনটা দেখা হবে ভেবেই নানুবাবু চাকরীটা করবেন বলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন। অবশ্য জয়েন করার আগে দিন সাতেক সময় চেয়ে নিলেন। ভাবলেন ঐ ক'দিন সোঁদরবন সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করে নেবেন। সুন্দরবন নামকরণ সম্পর্কে নানারকম তথ্য আছে। তার মধ্যে একটি হল এখানে সুন্দরী গাছের প্রাধান্য। পৃথিবীর ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের ১০% এই সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত। ম্যানগ্রোভ হল সেই সমস্ত উদ্ভিদ যারা লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত মাটিতে জন্মায়। সুন্দরী ছাড়াও গড়াণ, হেতাল অর্থাৎ লবণাক্ত জলের উদ্ভিদ এখানে জন্মায়। সমুদ্রের মোহনার কাছে যেখানে নদীতে ভরা কোটালের সৃষ্টি হয় সেখানেই ম্যানগ্রোভ অরণ্য দেখা যায়। মাটির ওপর বেরিয়ে আসা শ্বাসমূল, গাছকে ধরে রাখার জন্য চারদিকে ঠেসমূল, জল ধরে রাখতে বাষ্পমোচন বন্ধ করার জন্য মোমযুক্ত চকচকে পাতা, চাঁদনী রাতে এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। এই অরণ্যকেই বলা হয় বাদাবন।

সুন্দরবনেই বাঘের বাস। যে সে বাঘ নয়, একেবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

সুন্দরবনকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলা হয়। নদীবাহিত পলিমাটি মোহনায় এসে জমে জমে সৃষ্টি করে ত্রিভুজাকৃতি এই ব-দ্বীপ। পলিমাটি জমার কারণ জলে দ্রবীভূত কাদার তঞ্চন। এইভাবে সমুদ্র ও নদীর সংযোগস্থলে মাটি জমে জমে ব-দ্বীপ গড়িয়ে ওঠে। দ্বীপগুলি নদী, খাঁড়ি,খাল ও সমুদ্র দিয়ে বেষ্টিত থাকে। সোঁদর বনে এরূপ অসংখ্য দ্বীপের মধ্যে ৫৪টিতে মনুষ্য বসতি রয়েছে।

দ্বীপটির পূর্বে ইছামতী, পশ্চিমে হুগলী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। সুন্দরবনের বনাঞ্চল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে গণ্য। যদিও বনের বেশিটাই বাংলাদেশের মধ্যে পড়ে। বনের বিখ্যাত প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ১৯৮৪ সালে ছিল ৩৫৮০, ১৯৭২ সালে ছিল মাত্র ১৮২৭, ১৯৭৩ সালে টাইগার রিজার্ভ প্রোজেক্ট গড়ে ওঠার পরেই বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাঘ ছাড়াও ভগবৎপুরে গড়ে উঠেছে কুমীর প্রকল্প। সজনেখালিতে আছে পাখিরালয়। স্কুলে জয়েন করার আগে এই তথ্যগুলিই নানুবাবু সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে দিন সাতেক বাদে বাসন্তীতে নানুবাবু হাজির হলেন। স্কুলের পাশের বাড়িতে চিলেকোঠার একটা ছোট্ট ঘর নানুবাবুর জন্য বরাদ্দ হল। ঘরের পাশেই ছাদ। ছাদ থেকে হুগলা নদীর দৃশ্য বড় চমৎকার।

সোম থেকে শনি বাসন্তীতে থাকা। শনিবার স্কুল ছুটির পর হুগলা নদী পেরিয়ে সোনাখালি থেকে এক্সপ্রেস বাসে শেয়ালদা হয়ে বাড়ি ফেরা। সোমবার সকালে আবার যাত্রা। ক্যানিং থেকে বওয়াটা ছিল ভারী আনন্দের। ওই তল্লাটের সকল সরকারী কর্মচারী একসাথে উঠত বি.ডি.ও. সাহেবের লঞ্চে। কলেজের প্রিন্সিপাল, অধ্যাপক এবং স্কুল শিক্ষক কেউই বাদ যেত না। মাতলা পেরিয়ে ওপার থেকে বি.ডি.ও. অফিসের গাড়ীতে সোনাখালি। ওখান থেকে নৌকা পেরিয়ে বাসন্তীতে যে যার কর্মস্থল।

এক সোমবার যাওয়ার সময় ঘটল এক বিপত্তি। ক্যানিং স্টেশনে নেমে নানুবাবু দেখলেন চেকার ভেন্ডারওয়ালাদের কাছ থেকে টিকিট চেক করছেন। নানুবাবু ভাবলেন টিকিট চেকারকে দিয়ে আসি। কিন্তু টিকিট কোথাও খুঁজে পেলেন না। টিকিট নেই, নানুবাবু চেকারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। লঞ্চের যাত্রীরা নানুবাবুর পাশ দিয়ে চলে গেলেন। এদিকে লঞ্চ ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা শোরগোল। নানুবাবু দেখেন তাঁর লঞ্চের সহকর্মীরা স্টেশনমাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে চেকারের দিকেই এগিয়ে আসছেন। স্টেশনমাস্টাররবাবু তো এসেই চেকারকে এক ধমক, 'কাকে ধরে রেখেছো?' চেকার ততোধিক আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কই কাউকে তো ধরিনি।' উনি শিক্ষক, ছেড়ে দাও এক্ষুনি। নানুবাবুর দিকে তাকিয়েই চেকারবাবু সাস্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, 'আমি কি অপরাধ করে ফেলেছি। আপনি শিক্ষক, জাতির ভবিষ্যৎ। যদিও আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলিনি তবুও আমাকে মার্জনা করে দেবেন।' নানুবাবুকে নিয়ে তাঁর সহকর্মীরা লঞ্চের দিকে পা বাড়ালেন। মাথার থেকে দুশ্চিন্তা কিন্তু নানুবাবুর কমল না। লঞ্চে উঠে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে গিয়ে টিকিটের সন্ধান পাওয়া গেল। টিকিটটা সিগারেটের প্যাকেটে ঢুকে গিয়েছিল।

সোঁদরবনের আর একটি ঘটনা নানুবাবুকে একেবারে লেজেগোবরে করে ছেড়েছিল। শীতের দিনে গোসাবায় এসেছিল নট্ট কোম্পানীর যাত্রা 'গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম'। সকাল থেকেই নদীপথে নৌকা করে লোক চলেছে। সহকর্মী একজন বললেন বাড়িতে বসে থেকে কি করবেন, চলুন যাত্রা দেখে আসবো। হ্যামিলটন সাহেবের গড়া গোসাবা গ্রামটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে থাকলেও এ যাত্রায় সেটা সম্ভব নয়। রাতেই যাত্রা দেখে ফিরে আসতে হবে। পরের দিন আবার স্কুলে পরীক্ষা আছে।

বিকেলে জোয়ার আসার পর বাসন্তী ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ল। সন্ধ্যের আগেই গোসাবায় পৌঁছে গেল নৌকো। মাস্টারমশাই বলে সহজেই টিকিট জোগাড় হল। মাঠের ভেতর ঢুকে নানুবাবুর চোখ ছানাবড়া। স্টেজ থেকে প্রায় ৫০ ফুট দূরে বসার জায়গা। তখনই মাঠ অর্ধেক ভর্ত্তি। যাত্রা শুরু হতে ঘন্টাখানেক বাকী। জুতো খুলে বসার মিনিট দশেক বাদেই পেছন থেকে হৈ হৈ করে চীৎকার ও দৌড়াদৌড়ি। কে একজন বলল, 'প্রাণে বাঁচতে চাইলে সামনে দৌড়াও'। নানুবাবু জুতো পরার সময় পেলেন না। সোজা ছুটে মাঠের বাইরে। চটি জোড়া মাঠের ভেতরেই পড়ে রইল। ভিড়ের চাপে মাঠের বেড়া ভেঙ্গে দর্শকরা ঢুকে পড়েছে মাঠে।

পূর্ণিমার আলোয় চারদিক ভেসে গেলেও নদীতে তখন ভাটার টান। জল গেছে নেমে। চারদিক কাদা থই থই। খালি পায়ে ঐ কাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে নানুবাবু দুবার আছাড় খেলেন। শেষে এক ছাত্রের হাত ধরে কাদা মাখামাখি জামা প্যান্ট নিয়ে কোনক্রমে নৌকায় এসে উঠলেন। নানুবাবুর তখন শরৎচন্দ্রের নতুনদার মত অবস্থা। পরের দিন সকালে বাজার থেকে নতুন জামা-প্যান্ট ও জুতো কিনে তবে স্কুলে যেতে পারলেন।

সুন্দরবনে নানুবাবুর আর এক অভিজ্ঞতা, সিনেমা দেখা। সিনেমা হলে নয়, পর্দা টাঙিয়ে প্রোজেক্টরের সাহায্যে স্টেডিয়ামে সিনেমা দেখান হয়। স্টেডিয়াম! সে তো বিশাল ব্যাপার। বাসন্তীর

স্টেডিয়াম হল এক পুকুর। পাড়ে খাঁজ কেটে কেটে বসার জায়গা। নদীতে জল এলে পুকুরে জল ঢোকে। ভাঁটায় সব খটখটে। ভাঁটার সময় পুকুরের চারপাশে শাল খাটিয়ে সিনেমা। 'হংসরাজ' সিনেমা ভালই চলছিল। শুরু হতে দেরি করে ফেলায় শেষটা আর দেখা হল না কারুর। জোয়ারের সময় হয়ে গেছে। পুকুরে জল ঢুকছে। জলে কি আছে কে জানে। রাতের অন্ধকারে জলে ঢিল ছুঁড়লে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

শীত শেষ হয় হয়। সুন্দরবনের জঙ্গল ঘোরা এখনও হয়ে ওঠেনি নানুবাবুর। এক বন্ধুর চিঠি পেয়ে মনটা চনমন করে ওঠে নানুবাবুর। যাওয়া স্থির হল বাসন্তী থেকে নেতিধোপানীর ঘাট পর্যন্ত। মোটর লাগানো নৌকা ঐ পর্যন্তই যায়।

সঙ্গী চারজন। পথে পড়বে গোসাবা, শুয়োরমারী, সজনেখালি। সঙ্গীদের সাথে নানুবাবু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে কিছু ড্রাইফুড। শুয়োরমারীতে কিছু শুয়োর ঘুরলেও সজনেখালী একদম ফাঁকা। বর্ষায় সজনেখালী পাখির কলতানে মুখর হয়। পাখিরা তখন ডিম পেড়ে সন্তানকে বড় করে নদীর শামুক গুগলি খাইয়ে।

ছোট ছোট খাড়ি। খাড়ির দুপাশে গড়ান, হেতাল, সুন্দরী গাছের সমাহার। বাঘের দেখা পাওয়া গেল না। শেষে নেতিধোপানীর ঘাটে এসে ফরেস্ট গার্ডের কাছে বাঘের গল্প শোনা। বনে ঢোকার পারমিশন নেই। অনেক করে বলতে ফরেস্ট গার্ড সন্টপিটের কাছে নিয়ে গিয়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখাল। সে যাত্রায় নানুবাবুর কপালে ঐ টুকুই জুটল।

নানুবাবুর চাকরীর মেয়াদ এক বছরের। মেয়াদ শেষে ফেরার দিন ফেয়ারওয়েল নিয়ে ফিরতে নানুবাবুর বিকেল গড়াল। ফেরার তখন একটাই লঞ্চ সন্ধ্যা ৬টায়। এক্সপ্রেস লঞ্চ বলে ঘন্টা দুয়েক লাগবে ক্যানিং আসতে। মাস মাইনে, সুন্দরবনের মধু, সহকর্মীদের ভালবাসা নিয়ে নানুবাবু লঞ্চে চড়ে বসলেন।

দূরে আকাশের কোণে কালো মেঘের রেখা। ঝড় উঠতে পারে। ঝড় উঠলে মাতলা নদীর চেহারা ভয়ঙ্কর। লঞ্চ ছাড়ার আধ ঘন্টার মধ্যে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। উঠল তীব্র ঝড়। সঙ্গে বৃষ্টি। তীরের দিকে ঢেউয়ের প্রকোপ বেশি বলে মাঝনদীতে লঞ্চ থামিয়ে রাখা হল। লঞ্চের দুলুনিতে নানুবাবুর তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সারেঙ্গ-এর নির্দেশে নানুবাবু লঞ্চের মধ্যে শুয়ে পড়লেন। ঝড়-বৃষ্টি থামলে লঞ্চ চলা শুরু হল। ক্যানিং পৌঁছে নানুবাবু দেখলেন শেষ লোকালটা চলে গেছে। অগত্যা ক্যানিং-এ থাকা, এক সহকর্মীর বাড়িতে রাত কটিয়ে পরের দিনে বাড়ি ফেরা।

কাজ করতে গিয়ে সোঁদরবনের বাঘ দেখা না হলেও, বিচিত্র অভিজ্ঞতা নানুবাবুর ঝুলিতে জমা হয়ে রইল।

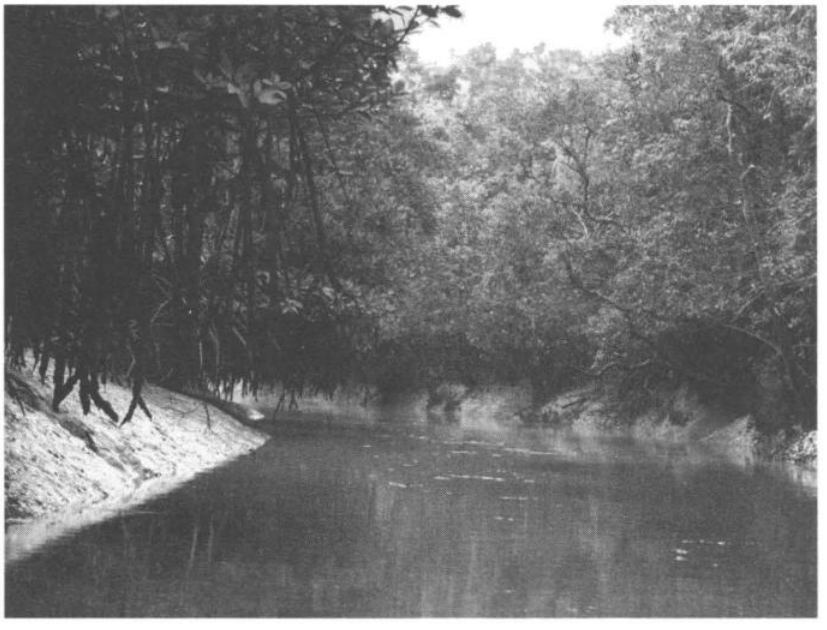

ছবি সূত্র - www.tour.com.bd/blog

লেখা ঃ রঙ যেন মোর মর্মে লাগে

মানুষের মেলায় রঙের খেলায়

ছবি - শর্মালী দাস

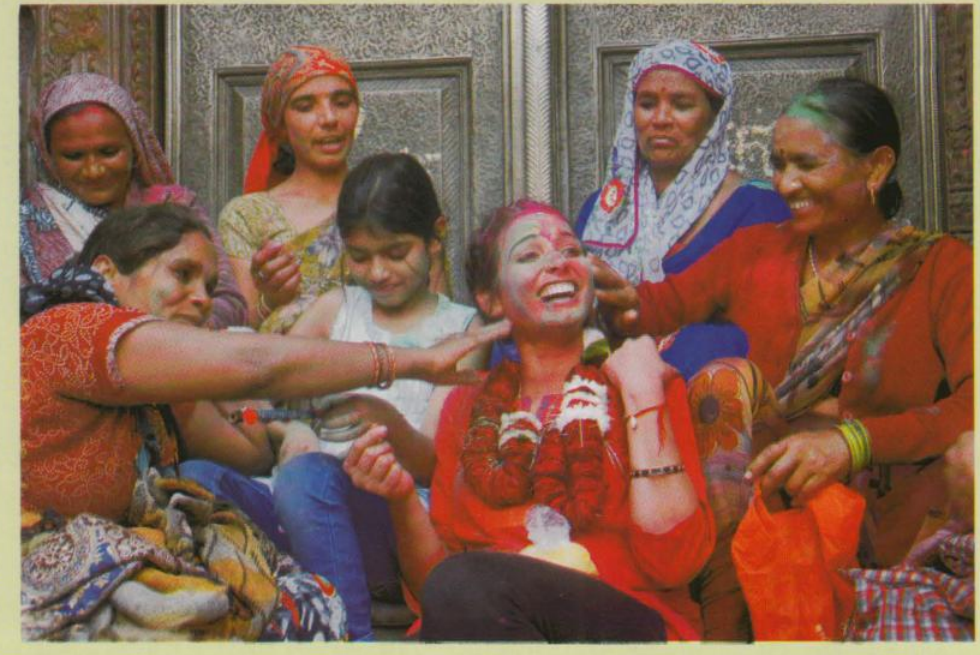

উচ্ছ্বাস

ছবি - শর্মালী দাস

With the Best Compliments From :

PENGUIN PAPER BOX

Manufacturer of High Quality Carton Boxes of different sizes
as per customer requirement.

Kalyani Industrial Estate-II, Plot No. - II/P-1/03, Block-D
Dist. Nadia, W.B. Pin - 741235
E-mail ID : penguinkly@gmail.com

MAC TECH

Manufacturing Fabricated Streel Drum, Steel Bobbin, Blender,
Coveyer, M S Crates, M S Tanks.
Faction Job of Factory Sheds and Plastic Unit - manufacturing
Pet Bottles of different sizes and shapes as per customer requirement

Kalyani Industrial Estate-II, Plot No. - II/P-1/05 & 10, Block-D
Dist. Nadia, W.B. Pin - 741235
E-mail ID : mactechkly@yahoo.com

Nirman Engineering Company

Activity : Industrial & Civil Construction, Steel Works, Pipe Line Laying,
Machine Unloading, Erection & Commissioning etc.

Kalyani Industrial Estate-II, Plot No. - II/P-1/02, Block-D
Dist. Nadia, W.B. Pin - 741235
E-mail ID : nirmankly@gmail.com

Registered Office :
A-8/149, Kalyani - 741235
Dt. Nadia, W.B., Pin - 741235
Contact Nos. & Persons -
Mobile No. Snigdha Roychowdhury (Partner) +91 9830222239
Mobile No. Of Sushovan Roychowdhury (Partner) : +91 8100252250